

## ছয়শো বছরের অটোমান সাম্রাজ্যের শুরু ও শেষ যেভাবে

**জহির-উদ-দীন বাবর** ভালো করেই জানতেন যে তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা শত্রু বাহিনীর তুলনায় আট ভাগ কম, তাই তিনি এমন একটি পদক্ষেপ নেন, যা **ইব্রাহিম লোদি** কল্পনাও করতে পারেননি।

বাবর ছিলেন মধ্য এশিয়ার মুসলিম সম্রাট ও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদি রাজবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর সেই পানিপথের যুদ্ধে অটোমান তুর্কিদের যুদ্ধ কৌশল ব্যবহার করেছিলেন বাবর।

### অটোমানদের উপহার যুদ্ধ কৌশল

তুর্কি অটোমানের যুদ্ধ কৌশল অনুযায়ী বাবরের বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে প্রথম সারিতে চামড়ার দড়ি দিয়ে সাতশ গরুর গাড়ি বাঁধেন। তাদের পেছনেই বসানো হয় যুদ্ধ কামান। বলে রাখা ভালো, এটি ছিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং এর আগে ভারতের কোনও যুদ্ধে কামানের ব্যবহার হয়নি। কামানের বিষয়ে অনেকে তখন জানতোই না।

শুরুর দিকে এই কামানগুলোর লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার ক্ষমতা খুব একটা ভালো ছিল না। তবে বাবর বাহিনী কামান থেকে নির্বিচারে গোলা বর্ষণ শুরু করলে এর আকস্মিক কান-ফাটানো বিস্ফোরণ ও ধোঁয়ায় আফগান বাহিনী বিভ্রান্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করে। অথচ ইব্রাহীম লোদির বাহিনীতে ৫০ হাজার সৈন্য ছাড়াও এক হাজারের মতো যুদ্ধ হাতি বা গজবাহিনী ছিল, কিন্তু সৈন্যদের মতো এই হাতিগুলোও আগে কখনও কামানের বিস্ফোরণ শোনেনি। এ কারণে কামান থেকে গোলা বিস্ফোরণের সাথে সাথে হাতিগুলো যুদ্ধে অংশ নেয়ার পরিবর্তে হতভম্ব হয়ে যায়, ধোঁয়ায় সবার শ্বাসরোধ হয়ে আসে। অন্যদিকে, বাবরের ১২ হাজার প্রশিক্ষিত অশ্বরোহী বাহিনী অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করা যোদ্ধারা এমন মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিল। তারা বিদ্যুতের গতিতে এগিয়ে গিয়ে লোদির সেনাবাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বাবরের বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

ইতিহাসবিদ পল কে. ডেভিস তার বই ‘Hundred Decisive Battles’-বইটিতে এই যুদ্ধকে ইতিহাসের সবচেয়ে ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সেই থেকেই মহান মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল।

অটোমান বা উসমানীয় যুদ্ধ কৌশল ছাড়াও বাবরের ওই যুদ্ধে দুই **তুর্কি গোলা নিক্ষেপকারী ওস্তাদ আলী ও মুস্তফা** এই বিজয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাবরকে **অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম খলিফা সেলিম** তার ওই দুই সেনাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে একটি, **অটোমান সাম্রাজ্য ১৩ শতকে উসমান গাজীর** হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে, **বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন** হয় এবং **আনাতোলিয়া অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত** হয়েছিল। উল্লেখ্য, **বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বর্তমান ইতালি, গ্রীস ও তুরস্ক আর উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অংশ** নিয়ে বিস্তৃত ছিল। অন্যদিকে, **আনাতোলিয়া হচ্ছে বর্তমান তুরস্কের বড় একটি অংশ।** উসমান গাজী, ১২৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সোগুত নামে ছোট একটি রাজ্যের তুর্কি সেনাপতি ছিলেন তিনি। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেবেন।

### উসমানের স্বপ্ন

**ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ক্যারোলিন ফিঙ্কেল তার 'উসমানস ড্রিম' বইতে লিখেছেন যে উসমান এক রাতে শেখ আদিবালি নামে এক বৃদ্ধ দরবেশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। ওই রাতে উসমান স্বপ্ন দেখেন যে তার বুক থেকে একটি বিশাল গাছ বেরিয়ে ডালপালা ছড়াচ্ছে এবং সারা বিশ্বে ছায়া ফেলছে। উসমান পরে শেখ আদিবালীর কাছে তার এই স্বপ্নের কথা জানান। শেখ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: "হে উসমান, বাবা আমার, ধন্য হও, আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার বংশধরদের কাছে রাজকীয় সিংহাসন অর্পণ করেছেন।"** এই স্বপ্নটি উসমান গাজীর জন্য একটি প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছিল কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি এখন ঈশ্বরের সমর্থন পেয়েছেন।

তারপর **উসমান গাজী আনাতোলিয়ার বেশিরভাগ অংশ জয় করে, আশেপাশের সেলজুক ও তুর্কোমান রাজ্যসহ বাইজেন্টাইন দখল করে নেন।** উসমানের স্বপ্নটি পরবর্তীতে অটোমান সাম্রাজ্যের যৌক্তিকতা এবং একইসঙ্গে মিথ বা পৌরাণিক কথায় পরিণত হয়। এই অটোমান সাম্রাজ্য ছয়শ' বছর ধরে শাসন করেছে। এমন দীর্ঘ সময় ধরে তারা কেবল আনাতোলিয়া নয়, বরং **তিনটি মহাদেশের বিশাল অংশ শাসন করে গিয়েছে।**

উসমানের উত্তরসূরির ইউরোপের দিকে নজর দেয়। তারা **১৩২৬ সালে গ্রীসের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর থেসালোনিকি জয় করে।** এরপর **১৩৮৯ সালে সার্বিয়া জয় করে।** কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় ও ঐতিহাসিক বিজয় ছিল **১৪৫৩ সালে। ওই বছর তারা বাইজেন্টাইনের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) জয় করে।** মুসলমানরা এর আগের সাতশ' বছর ধরে এই শহরটি দখলের চেষ্টা করলেও এটির ভৌগলিক অবস্থান এমন ছিল যে, তারা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। **কনস্টান্টিনোপলের তিন দিক বসফরাস সাগরে বেষ্টিত হওয়ায় এই শহরটি আশ্রয়ের শহর হয়ে উঠেছিল।** বাইজেন্টাইনরা গোল্ডেন হর্ন পথটি বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের ২৮টি যুদ্ধজাহাজ অন্য দিকে পাহারা দিয়েছিল। **গোল্ডেন হর্ন হচ্ছে বসফরাস সাগরের সরু এক প্রণালী, যা ছিল ইস্তাম্বুল শহরের প্রধান জলপথ।**

**উসমানীয় সুলতান মেহমেত ফতেহ ১৪৫৩ সালের ২২শে এপ্রিল এমন এক পদক্ষেপ নেন যা কেউ ভাবতেও পারেনি। তিনি মাটিতে তক্তা দিয়ে একটি মহাসড়ক তৈরি করেন এবং তেল-ঘি মিশিয়ে পথটিকে খুব পিচ্ছিল করে ফেলেন। তারপর গবাদি পশুর সাহায্যে তার ৮০টি জাহাজকে এই পথে টেনে নিয়ে যান এবং এভাবে সহজেই ওই শহরের বিস্মিত প্রহরীদের পরাস্ত করেন তিনি।** বিজয়ী হয়ে মেহমেত তার রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তর করেন এবং তাকে ‘সিজার অব রোম’ (রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) উপাধি দেয়া হয়।

### প্রথম উসমানীয় খলিফা

এরপর **বিজয়ী মেহমেতের নাতি ‘প্রথম সেলিম’** অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি **১৫১৬ ও ১৫১৭ সালে মিশরের মামলুকদের পরাজিত** করে, মিশর ছাড়াও বর্তমান **ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডানসহ সর্বোপরি হিজাজ** জয় করে তার **সাম্রাজ্যের আকার দ্বিগুণ** বাড়িয়ে ফেলেন। এর পাশাপাশি, **হিজাজের দুটি পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনা অধিগ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক হয়েছিলেন প্রথম সেলিম।** ধারণা করা হয়, **উসমানীয় খিলাফত ১৫১৭ সালে শুরু হয়েছিল, এবং প্রথম সেলিমকে প্রথম খলিফা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তার আগ পর্যন্ত উসমানীয়দের 'সুলতান' বা 'পাদশাহ্' বলা হতো।**

## খিলাফত শব্দের অর্থঃ ইসলামি শাসন সংস্থা – যার প্রধান থাকবেন খলিফা

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার 'ইস্যু অফ খিলাফত' বইতে লিখেছেন: 'সুলতান সেলিম খান প্রথমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অটোমান তুর্কি সুলতানরা সব মুসলমানের খলিফা ও ইমাম ছিলেন।' ‘এই চার শতাব্দীর মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে খিলাফতের দাবিদারও উঠেনি। সরকারের কাছে শত শত খলিফা দাবিদার উঠেছে ঠিকই কিন্তু কেউ ইসলামের কেন্দ্রীয় খিলাফত দাবি করতে পারেনি।’ **প্রথম সেলিমের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তিনি অল্প সময়ের মধ্যে একের পর এক সাম্রাজ্য দখল করতে পারতেন।** এর বড় কারণ ছিল তার কার্যকর যুদ্ধ কৌশল। পানিপথের যুদ্ধে তার এই রণকৌশল অনুসরণ করে ওই যুদ্ধে প্রথম গোলা বারুদ ব্যবহার করেন সম্রাট বাবর। ওই যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদিকে হারানোর পরই মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাবর।

## হমায়ুন বনাম খলিফা

বাবরের উত্তরসূরি হমায়ুনও অটোমানদের এই অনুগ্রহের কথা মনে রেখেছিলেন। সেলিমের ছেলে সালমান আলিশানকে লেখা একটি চিঠিতে হমায়ুন লেখেন:

*'খিলাফতের মর্যাদার ধারক, মহানতার স্তম্ভ, ইসলামের ভিত্তির রক্ষক সুলতানের জন্য শুভ কামনা। আপনার নাম সম্মানের সিলমোহরে খোদাই করা হয়েছে এবং আপনার সময়ে খেলাফত নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। মহান আল্লাহ যেন আপনার খেলাফত অব্যাহত রাখেন।'*

হমায়ুনের ছেলে আকবর অবশ্য উসমানীয়দের সাথে কোনও সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেননি। যার কারণ সম্ভবত এই যে, **ইরানের সাফাভিদ শাসকদের সাথে অটোমানরা তখন ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং আকবর সাফাভিদ শাসকদের ক্ষেপাতে চাননি।** তবে আকবরের উত্তরসূরি শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের অটোমান সুলতানদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। উপহার বিনিময় আর কূটনৈতিক মিশন তাদের মধ্যে সাধারণ বিষয় ছিল এবং তারা তাকে সমস্ত মুসলমানদের খলিফা বলে মনে করতেন। শুধু মুঘলরা নয়, অন্যান্য ভারতীয় শাসকরাও অটোমানদেরকে তাদের খলিফা হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং ক্ষমতায় আসার পর তাদের কাছ থেকে আনুগত্য নেওয়া জরুরি বলে মনে করতেন।

**টিপু সুলতান** মহীশূরের শাসক হওয়ার পর, তিনি তৎকালীন অটোমান **খলিফা তৃতীয় সেলিমের** কাছ থেকে তার শাসনের জন্য সমর্থন চাইতে কনস্টান্টিনোপলে একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। তৃতীয় সেলিম টিপু সুলতানকে তার নাম সম্বলিত একটি মুদ্রা টাকশাল করতে এবং শুক্রবারের খুতবায় তার নাম পাঠ করার অনুমতি দেন।

**তবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য টিপু সুলতান যখন সামরিক সহায়তা চেয়েছিলেন তখন অটোমান খলিফা সেই অনুরোধ গ্রহণ করেননি।** কারণ **সে সময় তিনি নিজে রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন** এবং তখন শক্তিশালী ব্রিটিশ শত্রুদের পরাস্ত করা বেশ কঠিন হতো।

**সুলতান সুলেইমান** (যাকে ঘিরে তুরস্কের জনপ্রিয় সিরিয়াল সুলতান সুলেইমান নির্মাণ করা হয়েছে। সিরিয়ালটি বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করে।)

অটোমানরা শুরুতে ইউরোপের অনেক অঞ্চল দখল করে। তবে এই সাম্রাজ্য **রাজনীতি, রণনীতি, অর্থনীতি - এই তিনটি ক্ষেত্রেই সবচেয়ে প্রসার লাভ করে প্রথম সুলেইমানের আমলে।** তিনি ১৫২০ থেকে ১৫৬৬ সালে টানা ৪৫ বছর আমৃত্যু শাসনভারে ছিলেন। **সুলেইমান আলী** খানের শাসনামলে **সালতানাত বা অটোমান সাম্রাজ্য তার সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শীর্ষে পৌঁছেছিল।** এ কারণে **তিনি পশ্চিম ইউরোপে 'সুলেইমান দ্য মেগনিফিসেন্ট'** নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। অন্যদিকে, নিজ সাম্রাজ্যে তাকে বলা হতো **কানুনি সুলতান। বেলগ্রেড ও হাঙ্গেরি জয় করে সুলেইমান তার সীমানা মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন।** তবে দু'বার চেষ্টা করেও অস্ট্রিয়ার বিলাসবহুল শহর ভিয়েনা জয় করতে পারেননি তিনি।

## ইউরোপ এগিয়ে যায়

**ইউরোপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ১৬ ও ১৭ শতকে বিশ্বের বাকি অংশকে ছাড়িয়ে যায়।** এর একটি কারণ সে সময় **জাহাজ শিল্প বিকাশ লাভ** করছিল। এটি ছিল **ইউরোপের 'আবিষ্কারের যুগ'।** অর্থাৎ ইউরোপীয় নৌবহর, বিশেষ করে **স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ডাচ আর ব্রিটিশ নৌবহরগুলো সারা বিশ্বের সমুদ্র অন্বেষণ করছিল।** এভাবে আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার হয় এবং ইউরোপীয়রা তা দখল করে। এই দখলদারিত্বের কারণে ইউরোপ বাকি বিশ্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এসময় ইউরোপীয় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে। ইউরোপীয়দের জন্য বেশি বেশি জলযান চালাতে নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করা এবং যন্ত্রগুলো উন্নত করার প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

এই প্রয়োজনীয়তা থেকে সে সময় ইউরোপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন করতে থাকে। **এ সময় দ্বিতীয় আরেকটি শিল্প বেশ বিকাশ লাভ করে। আর সেটি হচ্ছে ছাপাখানা।** এই ছাপাখানার উদ্ভাবন হয়েছিল ১৪৩৯ সালে। ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা রেখেছিল এই ছাপাখানা। সেই সময় **বিজ্ঞান ও কলা - দুটি বিষয়ের উপর শুধুমাত্র অভিজাত ও গির্জার একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, ছাপাখানার বদৌলতে তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসে।** অটোমানরাও যদি ছাপাখানা ব্যবহার করা শুরু করতো, তাহলে হয়তো আজ পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হতো।

আমেরিকা মহাদেশে কলম্বাসের আগমন ছিল ইউরোপের ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট। ওই সময় থেকে ইউরোপে জ্ঞান ও শিল্পের এক নতুন যুগের সূচনা হয়। কিন্তু **সুলতান ফাতিহের পুত্র দ্বিতীয় বায়েজিদ ১৪৮৩ সালে, যারা আরবি হরফে বই ছাপাতেন, তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড আরোপ করেন।** এর কারণ ছিল, আলেমগণ ছাপাখানাকে ফেরাঞ্জিদের উদ্ভাবন বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাদের মতে, ফেরাঞ্জিদের আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে কুরআন বা আরবি লিপিতে বই ছাপানো ধর্মবিরোধী।

তাই ইউরোপ যখন সময়ের সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন অটোমান সাম্রাজ্য বছরের পর বছর ততটাই পেছাতে থাকে এবং সংকুচিত হতে থাকে। এরপর **ব্রিটিশরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আনাতোলিয়া ছাড়া তাদের প্রায় সমস্ত অঞ্চল দখল করে নেয়।** **ভারতের মুসলমানরা এতে অনেক ভেঙে পড়ে কারণ তারা অটোমান খলিফাকে তাদের ধর্মীয় শাসক ও নেতা হিসাবে বিবেচনা করতো।**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরিকল্পিত ভাঙ্গন এবং তাদের উপর ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক প্রচারণা শুরু করে যাকে ‘**খিলাফত আন্দোলন**’ বা ‘**তেহরিক-ই-খিলাফাহ**’ বলা হয়। ১৯১৯ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে এই খিলাফত আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এই আন্দোলন থেকে ব্রিটিশদের হমকি দেওয়া হয়েছিল যে, “*যদি তারা অটোমান খলিফা আবদুল হামিদকে পদচ্যুত করার চেষ্টা করে তবে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে*”।

খলিফা আন্দোলনে যোগ দেয়া নেতাদের মধ্যে আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, হাসরাত মোহানি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, জাফর আলী খান, মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও হাকিম আজমল খান অন্যতম ছিলেন।

গান্ধী ছিলেন খিলাফতের সাথে, সরে দাঁড়িয়েছিলেন কায়েদ-ই-আজম। **ভারতের কংগ্রেস পার্টি বা ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-আইএনসি’ ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে।** **মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আইন অমান্য অভিযানের সূত্রপাত হয়েছিল এই খিলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই।**

মজার ব্যাপার হলো, কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেকে এই আন্দোলন থেকে দূরে রেখেছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে এটি সফল হবে না।

এই আন্দোলন গতি পাওয়ার আগে, **১৯২২ সালে কামাল আতাতুর্কের** নেতৃত্বে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী বাহিনী দেশটি দখল করে এবং খলিফা আবদুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করে খিলাফতের পদ বাতিল করে।



এর মাধ্যমে অটোমানদের ৬২৩ বছরের মহান সাম্রাজ্যের সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় খিলাফত আন্দোলনে বেশ উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী লিখেছেন: 'যারা ১৯২১ থেকে ১৯২২ সময়কাল দেখেননি তাদের জন্য বলতে হয় যে সে সময় ভারত একটি আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়েছিল, উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 'মিত্রশক্তি'র বিজয় তাদের পরিকল্পনা এবং খিলাফতের অবসান ঘটিয়েছিল। তাদের দখলের এই খবর সারা ভারতে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। মসজিদ, সমাবেশ, মাদ্রাসা, বাড়িঘর, দোকানপাট কোথাও যেন এই বিষয় ছাড়া আর কোনও কথাবার্তাই হতো না।

উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, ইতালি, জাপান এবং ১৯১৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে 'মিত্রশক্তি' বলা হতো।

সে সময় প্রতিটি যুবক, বৃদ্ধ, শিশু ও নর-নারীর মুখে এই একটি কবিতা উচ্চারিত হতো, যার বাংলা অনুবাদ অনেকটা এরকম:

“বল মোহাম্মদ আলীর মা/দাও বাছা, তোমার জান দাও খলিফাকে”

আন্দোলন সফল করার জন্য সাধারণ মানুষ উৎসাহী ছিল এবং নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে অবদান রেখেছিল। এমনকি সারা ভারত থেকে নারীরা তাদের চুড়ি ও কানের দুল খুলে খিলাফত কমিটিতে দিতেন। প্রচলিত আছে যে, এক নারী তার সন্তানকে নিয়ে এসে খিলাফত কমিটির কাছে হস্তান্তর করেন এই বলে যে, এই বাচ্চা ছাড়া আমার দান করার কিছু নেই। এরপরও খিলাফত আন্দোলন সফল হয়নি, কিন্তু তুরস্কের মানুষ আজও এই চেতনাকে মনে রেখেছে।

যারা তুরস্কে গেছেন তারা বলছেন, ভারতবর্ষের এই মুসলমান সম্প্রদায়ের যে সম্মান তুরস্কে আছে তা অন্য কোনও দেশে নেই।

## কনস্টান্টিনোপল কীভাবে ইস্তাম্বুল হলো?

তুরস্কের ইস্তাম্বুল নানা কারণে ঐতিহাসিক শহর। এটি বিশ্বের শহরগুলোর মধ্যে বিরলও বটে। কারণ, শহরটি একই সঙ্গে এশিয়া (মধ্যপ্রাচ্য) এবং ইউরোপের অংশ। অবস্থানগত দিক থেকে এই বিশেষত্বই বলে দেয় কেন শহরটি শত শত বছর ধরে সাম্রাজ্যগুলোর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। একসময় ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এই শহর, তখন এর নাম ছিল কনস্টান্টিনোপল। পরবর্তী সময়ে এটি অটোমান সাম্রাজ্যেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

## কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের নাম কীভাবে ইস্তাম্বুল হলো?

অনেকে মনে করতে পারেন, শহরটি দখল করার পর অটোমানরা এর নাম পরিবর্তন করেছিল। আসলে তা নয়। বহু বছর ধরে শহরটি পরিচিত ছিল ‘Constantinople’ শব্দেরই বিভিন্ন রূপে। যেমন অটোমানরা শহরটির নামের বানান লিখত ‘Kostantiniyy’। আবার কনস্টান্টিনোপলের আগেও শহরটি বেশ কিছু নামে পরিচিত ছিল। শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিল গ্রিকরা, ৬৫৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। তখন এর নাম ছিল Bazantion। এই শব্দেরই লাতিন সংস্করণ হচ্ছে Byzantium। নিউ রোম, অগাস্টা অ্যান্টোনিয়া, কুইন অব সিটিস, দ্য সিটি ইত্যাদি নামেও একসময় শহরটিকে চিনত মানুষ। ৩৩০ সালে রোমান সম্রাট কনস্টানটিন ক্ষমতায় এসে নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে এর নাম রাখেন কনস্টানিনোপল। সম্রাট কনস্টান্টিন ছিলেন প্রথম রোমান সম্রাট, যিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রোমানদের পর অটোমানরা ক্ষমতা দখল করলেও শহরের নাম তারা পরিবর্তন করেনি।

তবে রোমান সাম্রাজ্যের মানুষ গ্রিক শব্দভান্ডারের is tim'bolin বা eis tan polin-এর সঙ্গে মিল রেখে কনস্টান্টিনোপলকে Istanpolin নামে ডাকতে শুরু করে, যার অর্থ ‘শহরের দিকে’। কিন্তু শহরের দাপ্তরিক নাম তখনো পরিবর্তন করা হয়নি। এরপর কয়েক শতাব্দী পার হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নামের উচ্চারণ ও বানানেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৯২২ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তুরস্ক। এর কয়েক বছর পর, ১৯৩০ সালে তুর্কি ডাকসেবা শহরের নাম স্থায়ীভাবে ‘ইস্তাম্বুল’ করার সিদ্ধান্ত নেয়। একই বছর যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের দাপ্তরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় শহরটির নাম ‘ইস্তাম্বুল’ হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তী সময়ে একই পথ অনুসরণ করে বাকি দেশগুলো। তবে এটা নিশ্চিত করে বলার জো নেই যে ঠিক কবে, কখন শহরটির নাম কনস্টান্টিনোপল থেকে ইস্তাম্বুল হলো। কারণ, আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তাম্বুল নামকরণের অনেক আগে থেকেই মানুষ শহরটিকে এ নামেই চিনত।

## ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি — ১৬৪৮

ইউরোপীয়ান রিফরমেশনের মাধ্যমে খ্রিষ্টান ধর্ম ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে- ক্যাথলিক (যারা পোপের পক্ষে ছিলো) এবং প্রটেস্ট্যান্ট (যারা পোপের বিপক্ষে ছিলো)। প্রোটেস্ট্যান্টের নেতা ছিলেন জার্মানির ধর্ম সংস্কারক মার্টিন লুথার। এর রিফর্মেশনের ফলে ইউরোপে ৩০ বছর ধরে ধর্ম যুদ্ধ চলে। অতঃপর ১৬৪৮ সালে জার্মানির ওয়েস্টফেলিয়া শহরে ৩টি শান্তি চুক্তি হয় যার মাধ্যমে ৩০ বছরের ধর্ম যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

এ সময় ৩টি চুক্তি হয়ঃ

১. পিস অফ মুনস্টারঃ ডাচ-স্পেনের মধ্যে (৮০ বছরের যুদ্ধের অবসান হয়)

২. মুনস্টার চুক্তিঃ রোমান-ফ্রান্স

৩. ওসনারাক চুক্তিঃ রোমান-সুইডেন

**ফলাফলঃ** ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শুরু ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা স্থাপন (Modern nation-state system)

## ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮-৮৯)

১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ইউরোপে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার ৩০ বছরের ধর্ম যুদ্ধ শেষ হয়। এরপর ইংল্যান্ডের রাজা ২য় জেমস পুনরায় ক্যাথলিকতন্ত্র চালু করতে চান। কিন্তু এবার তার বিরোধিতা করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ (House of Lords)। এই বিপ্লবে পার্লামেন্টের সদস্যগণ সুবিধাজনক স্থানে নিজেদের নিতে সক্ষম হন এবং ১৬৮৯ সালে ইংল্যান্ডে ঐতিহাসিক Bill of Rights পাশ করেন।

**ফলাফলঃ** এর ফলে ইংল্যান্ডে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। ১৭০৭ সালে গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেন্ট চালু হয় যা পৃথিবীর প্রাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থার সূচনা করে।

বি. দ্র.: ইংল্যান্ডে ১২১৫ সালে পার্লামেন্ট চালু হয়

গ্রিসঃ প্রাচীনতম গণতন্ত্র  
ব্রিটেনঃ প্রাচীনতম সংসদ

## আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮৩)

ব্রিটেনের বণির সম্প্রদায় আমেরিকার ১৩ টি অঙ্গরাজ্যে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলো। ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে “চা আইন” পাশ হলে এর মার্কিনীরা ইউরোপীয় বণিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ “বোস্টন চা পার্টি” আয়োজন করে যেখানে চা ভর্তি জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেয়া হয়। বলে রাখা ভালো, আমেরিকা এবং বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র নেই। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে সেনাপতি ছিলেনঃ **লর্ড কর্নওয়ালিস**

পরবর্তীতে **০২ জুলাই, ১৭৭৬ — থমাস জেফারসন** আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন এবং **আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।**

তার ২দিন পর, **০৪ জুলাই, ১৭৭৬ আমেরিকার কংগ্রেসে এই ঘোষণাপত্রটি পাস হয়।** তাই **আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসঃ ০৪ জুলাই.**

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্স সরাসরি আমেরিকাকে সমর্থন করে। ফলে ফ্রান্সের অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের ১১০ বছর পর, ফ্রান্স আমেরিকাকে **১৮৮৬ সালে স্ট্যাচু অব লিবার্টি** উপহার দেয়। অন্যদিকে ফরাসি বিপ্লবের ১০০ বছর পর আমেরিকা ফ্রান্সকে ১৮৮৯ সালে **আইফেল টাওয়ার** উপহার দেয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়কঃ **জর্জ ওয়াশিংটন**

**ফলাফলঃ ১৭৮৩ সালে প্যারিসে ১ম ভার্সাই চুক্তির** মাধ্যমে ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতা মেনে নেয়। [২য় ভার্সাই চুক্তিঃ ১৯১৯]

## আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫)

স্বাধীনতার প্রায় ১০০ বছর পর, ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকায় একটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় southern states এবং northern federal states এর মধ্যে। এই গৃহযুদ্ধে northern federal states জয়ী হয়।

গৃহযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট ছিলেনঃ **আব্রাহাম লিংকন**, যাকে **সং প্রতিবেশী নীতির প্রবক্তা** বলা হয়।

**ফলাফলঃ** আব্রাহাম লিংকন — **১৮৬৩ সালে দাসপ্রথার বিলুপ্তি** ঘটান, কিন্তু ১৮৬৫ সালে তিনি উইলক্স বুথ নামক আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন।

আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তিঃ Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth.

## ট্রাফালগার যুদ্ধ (২১ অক্টোবর, ১৮০৫)

ইউরোপে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলো স্প্যানিশ সাম্রাজ্য যা তৎকালীন নেপলিওনের অধীনে ছিল। ইউরোপে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করার জন্যে তাদের সামনে ছিলো শুধু একটি বাধা, যা ছিলো ব্রিটেনের দি রয়েল নেভি। এই যুদ্ধে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্পেন ও ফ্রান্স যৌথ ভাবে যুদ্ধ করে।

স্প্যানিশ ৩৩টি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এডমিরাল **ভিলনভস স্পেনের কেপ ট্রাফালগারের কেডিজ** নামক স্থানের দিকে রওনা দেয়। অপরদিকে ২৭টি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এডমিরাল **নেলসনের** নেতৃত্বে এগিয়ে যায় যুদ্ধের দিকে। সকাল ১১ টার দিকে লর্ড নেলসন তার জন্মভূমি ইংল্যান্ডে একটি বার্তা পাঠায়, যাতে লেখা ছিলোঃ **“প্রত্যেকটি সৈনিক নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করবে”।**

এই যুদ্ধে প্রায় ৮০০০ ফ্রেঞ্জ-স্প্যানিশ সৈন্য মারা যায় এবং প্রায় ৭০০০ ফ্রেঞ্জ-স্প্যানিশ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। অপরদিকে ব্রিটেনের প্রায় ২০০০ সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধে ফ্রেঞ্জ-স্প্যানিশ নৌবাহিনী ব্রিটিশ রয়েল নেভির কাছে আত্মসমর্পণ করে। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সেনাপতি এডমিরাল **নেলসন এই যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।**

এটি ব্রিটেনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নৌ-বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয় কারণ ১ম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত কোনো দেশ ব্রিটেনকে এত গুরুত্বর ভাবে আক্রমণ করে নি।

**ট্রাফালগার স্কয়ারঃ সেন্ট্রাল লন্ডন, ইংল্যান্ড**

## ওয়াটারলু যুদ্ধ (১৮ জুন, ১৮১৫)

**পক্ষঃ** ফ্রান্স বনাম ব্রিটেন, প্রুশিয়া (জার্মানি) সহ মোট ৭টি দেশের জোট

**বেলজিয়ামের** রাজধানী ব্রাসেলসের কিছুটা দূরে **সোনিয়ান বনাঞ্চলের** পাশে ওয়াটারলু-এর অবস্থান। ব্রিটিশ সৈন্যদের নিয়ে এখানে হাজির হয়েছেন **ব্রিটিশ সেনাপতি আর্থার ওয়েলসলি।** তখন সকাল বেলা, গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে, ফলে রাস্তা ভেজা। তখন **প্রুশিয়া সেনাপতি ব্লুচার** ও তার সৈন্যরা সেখানে পৌছায়নি-তারা পৌছেছিলো দুপুরের দিকে। ব্রিটিশ-নেদারল্যান্ডস-প্রুশিয়াদের যৌথ বাহিনীতে প্রায় ৬৮ হাজার সৈন্য ছিলো। ওয়াটারলু-এর পাশে সোনিয়ান বনভূমি ব্রিটিশ সৈন্যদের একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। বনভূমির অপরদিকে ঢালু জমিতে নেপোলিয়ন তার সেনাদের নিয়ে সমাবেত হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে রাস্তা ভেজা থাকায় নেপোলিয়ন তার সকল কামান নিয়ে আসতে পারেনি। যদিও ফ্রান্সের কামান সংখ্যা ব্রিটিশদের যৌথ বাহিনীর কামান সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিলো।

এ অবস্থায় নেপোলিয়ন একটি কৌশলগত ভুল করে বসে, যার খেসারত তাকে দিতে হয়েছিল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে। নেপোলিয়ন ভেবেছিলো দুপুরের দিকে রাস্তা শুকিয়ে গেলে সকল কামান নিয়ে এসে ব্রিটিশদের হারিয়ে দিবে। কিন্তু সকালে যদি নেপোলিয়ন আক্রমণ করতো, তাহলে তার সামনে থাকতো শুধুমাত্র ব্রিটিশ-নেদারল্যান্ডস যৌথ বাহিনী। কারণ, প্রুশিয়া সৈন্যরা দুপুরের দিকে এসে পৌছেছিলো।

বেলা ১১ টার দিকে যুদ্ধ শুরু হলে ফ্রান্স বেশ সুবিধাজনক স্থানে চলে আসে এবং ব্রিটিশদের ক্যাম্প দখল নিতে থাকে। কিন্তু দুপুরের দিকে প্রুশিয়া সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছালে ব্রিটিশ সেনাপতি ওয়েলসলি প্রুশিয়া সেনাপতি ব্লুচারকে অন্যদিক দিয়ে ফ্রেঞ্চ সেনাদের আক্রমণ করতে বলে। ব্রিটিশ-নেদারল্যান্ডস-প্রুশিয়া মিলিত আক্রমণে ফ্রেঞ্চ বাহিনী পরাজিত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বেলজিয়াম থেকে দেশে ফিরলে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের রাজনৈতিক সমর্থন কমে যায়। ফলে নেপোলিয়ন তার ছেলেকে সম্রাট ঘোষণা করে আমেরিকার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়েন। কিন্তু বন্দরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর টহলের ফলে তা আর হয়ে ওঠে না। নেপোলিয়ন জানতেন, তিনি প্রুশিয়াদের সাথে যেরকম ব্যবহার করেছেন, এতে যদি তিনি প্রুশিয়া সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন, তবে তাকে সইতে হবে নিদারুণ যন্ত্রণা। তাই তিনি ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরবর্তীতে **১৮শ লুই ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন।**

উল্লেখ্য রাজা ১৬শ লুইয়ের পতনের মাধ্যমে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের সমাপ্তি হয়। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ঘটে।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী নেপোলিয়নকে আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করে, এবং **০৫ মে, ১৮২১ সালে মারা যান।**



## চীনের আফিম যুদ্ধ

পাড়া মহল্লার চায়ের দোকানগুলোতে ‘চায়ের কাপে ঝড়’ ব্যাপারটার সাথে হয়তো আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। কিংবা ছোটবেলায় **Phrase and idioms** পড়তে গিয়ে ‘Storm in a tea cup’ নিশ্চয়ই পড়েছেন। খেলাধুলা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার একপর্যায়ে তুমুল যুদ্ধ হরহামেশাই ঘটে থাকে। তবে এ যুদ্ধ কথার কথা হলেও, **ইতিহাসে চা কে কেন্দ্র করে যে সত্যিকার অর্থেই এক ভয়ংকর যুদ্ধের সূচনা ঘটেছিলো**, সে গল্প হয়তো এতটা পরিচিত নয়। কিন্তু নামটা বেশ পরিচিত, আফিম যুদ্ধ। চীন এবং ব্রিটেনের মাঝে ঘটে যাওয়া ইতিহাসের অন্যতম এক বিতর্কিত যুদ্ধ। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় এটিই।

আফিম যুদ্ধের পেছনে শুধুমাত্র চা-কে একতরফা ভাবে দায়ী করা ঠিক হবে না। অনেকগুলো ছোট ছোট ঘটনার ফলাফল এ যুদ্ধের মহল তৈরি করতে সহায়তা করেছিলো। ঘটনার সূত্রপাত ১৮ শতকের শেষদিকে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে **ইউরোপিয়ানদের কাছে চীনের পোর্সেলিন, সিল্ক এবং চায়ের চাহিদা ছিলো প্রচুর পরিমাণে**। বিশেষ করে চা। কিন্তু বিনিময়ে অন্য দেশের পণ্যের বিষয়ে চীনাদের কোনো আগ্রহ ছিলনা। সুতরাং, এখানে এক অসম ব্যবসায়ের সূত্রপাত ঘটে।

যেহেতু চীনকে দেওয়ার মতো ব্রিটিশদের কাছে অন্য কোনো পণ্য ছিলো না, সেহেতু **চায়ের বিনিময়ে চীন সিলভার কয়েন দাবী করে বসে**। কেননা চীনে শুধুমাত্র সিলভারেরই অপ্রতুলতা ছিল। ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের রাজকোষ ফাঁকা হতে শুরু করে। এছাড়া, **সম্পূর্ণ চীনের শুধুমাত্র একটা বন্দরে ব্রিটিশদের বাণিজ্য করার অনুমতি ছিল — ক্যান্টন**। সবকিছু মিলিয়ে ব্রিটিশদের আসলেই পোষাছিল না। তাদের টার্গেট ছিলো, যেভাবেই হোক চীনের এই বিশাল বাজার দখলে আনতে হবে। তো তারা এক অভিনব উপায় বের করে, যা তাদেরকে বানিয়েছিলো ইতিহাসের ভয়ংকর এক মাদক ব্যবসায়ী।



ক্যান্টন পোর্ট, চীন

সেসময় বাংলার মাটিতে শাক সবজির পাশাপাশি আরও একটা জিনিস খুব ভালোভাবে চাষ করা সম্ভব ছিলো, সেটা হলো পপি। এই পপির বীজ থেকে পাওয়া যেত আফিম, যা মরফিন এবং হেরোইন-এর প্রধান উপকরণ। তো **ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি এই আফিম বিক্রি শুরু করে চীনে**। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় চীনের কঠোর নিয়মনীতি। **চীনে আফিমকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়**। ফলে ব্রিটিশদের নিতে হয় অন্য এক পথ। **মাদক পাচার**। ধীরে ধীরে চীনের সৈনিক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগন আফিমে আসক্ত হতে থাকে এবং **আফিমের চাহিদাও বাড়তে থাকে**।

**আফিম থেকে ব্রিটিশরা যে লাভ পেত আবার সেটা ব্যবহার করেই চীনের কাছ থেকে চা কিনতে শুরু করে তারা**। সব মিলিয়ে চীনের রাজা এ ব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ হন। তিনি চীন থেকে সকল ধরনের আফিম নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেন। তার আদেশেই **ক্যান্টন বন্দরে প্রায় ১.২ মিলিয়ন কেজি আফিম নষ্ট করে ফেলা হয়** বা সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ব্রিটিশ আফিম ব্যবসায়ীরা বেশ ক্ষুব্ধ হয়। ধীরে ধীরে চীন এবং ব্রিটিশদের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটতে থাকে।



পপি ফলের বীজ

ব্যবসায়ীদের চাপের মুখে ১৮৩৯ সালের দিকে ব্রিটিশরা চীনের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এটাই প্রথম আফিম যুদ্ধ নামে পরিচিত। **১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলমান ছিলো**। আফিমের নেশায় আসক্ত চীনা সেনাবাহিনী ব্রিটিশদের সামনে বলতে গেলে দাঁড়াতেই পারেনি। প্রথম আফিম যুদ্ধে চীনের পরাজয় ঘটে খুব সহজেই। যদিও এত সহজে এ ঘটনা ব্যাখ্যা করা বেশ মুশকিল। এ যুদ্ধের ঘটনা বেশ জটিল এবং বিতর্কিত। **১৮৪২ সালের ২৯ আগস্ট নানকিং চুক্তির মাধ্যমে প্রথম আফিম যুদ্ধের অবসান ঘটে**। এ চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশদেরকে চীন সিলভার কয়েনে ২১ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয় এবং সেই সাথে **ক্যান্টনের পাশাপাশি আরও ৪ টি বন্দর বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হয়**। এভাবে চীনের একচেটিয়া ব্যবসার অবসান ঘটে। **কিন্তু এত কিছুর পরেও ব্রিটিশরা আফিম ব্যবসাকে চীনে বৈধতা দিতে পারেনি**। ফলে আরও কয়েক বছর ধরে চলে আফিমের অবৈধ চোরাচালান, যা দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলো।





প্রথম আফিম যুদ্ধ

প্রথম আফিম যুদ্ধের চুক্তিতে ব্রিটিশরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে তাদের সাথে আরও যোগ দেয় ফ্রান্স এবং আমেরিকা। তারা একসাথে হয়ে ১৮৫৬ সালের দিকে চীনের কাছে চুক্তি সংশোধনের দাবী জানায়। কিন্তু চীন কোনোভাবেই আবার চুক্তি সংশোধনের ব্যাপারে রাজি হয়না। ফলে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হতে শুরু করে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি চূড়ান্ত পরিণতি পায় ‘arrow’ নামে একটি ছোট্ট জাহাজকে কেন্দ্র করে। জাহাজটি মূলত ছিলো চীনা জাহাজ। কিন্তু জাহাজটি হংকং এর এক ব্রিটিশ কম্পানির কাছে রেজিস্ট্রিকৃত ছিলো। ফলে জাহাজে ব্রিটিশ পতাকা লাগানো ছিলো। ঐ বছরই ৪ঠা অক্টোবর এক কুখ্যাত জলদস্যু ধরতে গিয়ে ৪ জন চীনা অফিসার ৬০ জন সৈন্যসমেত ঐ জাহাজে উঠে পড়ে। ধস্তাধস্তিতে জাহাজে থাকা ব্রিটিশ পতাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে ব্রিটিশরা পতাকা অবমাননার দায়ে চীনকে ক্ষমা চাইতে বলে। কিন্তু চীন এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায়। এবং ফলাফলস্বরূপ শুরু হয় দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ফ্রান্সও এগিয়ে আসে ব্রিটিশদের সাথে এবং আবারও চীনের পরাজয় ঘটে। চীনের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটার পরে তারা নতুন চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এ চুক্তিতে চীনকে আরও কিছু সমুদ্রবন্দর ছেড়ে দিতে হয় এবং এতদিন ধরে ব্রিটিশরা যে কারণে যুদ্ধ করে গেল সে আশা পূরণ হয় শেষ পর্যন্ত। অবশেষে নতুন চুক্তিতে চীনে আফিম বাণিজ্য বৈধ ঘোষণা করা হয়।



দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ

অনেকের মতে আফিম যুদ্ধের পেছনে আফিম ছিল একটা অজুহাত মাত্র। মূলত চীনের ওপর ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবেরই প্রতিফলন হিসেবে শুরু হয়েছিলো এই আফিম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলাফলে চীনকে উন্মুক্ত করেছিলো পুরো বিশ্বের বাজারে। কিন্তু চীনাদের কাছে এ যুদ্ধের ফলে করা চুক্তিগুলো ছিলো বড়ই অপমানের। চীনের ইতিহাসে এ ঘটনাকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘Century of humiliation’ হিসেবে।

তো আফিম যুদ্ধের এই বিতর্কিত ইতিহাস হয়তো আজও কোনো চায়ের দোকানে ‘চায়ের কাপে ঝড়’ তোলার মত বিষয়বস্তু। কিংবা সকালে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চায়ে একটু চুমুক দিয়ে আপনিও ভাবতে পারেন, ‘যদি আফিম যুদ্ধ না হতো, তাহলে আপনার হাতের এক কাপ চা কি এতো সহজে আপনার আপনার হাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারতো?’

## ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

\*\* বিদেশি ভাষায় বা ইংরেজিতে অটোমান সাম্রাজ্যকে তুরস্কের ভাষায় বলা হয়ঃ উসমানী সাম্রাজ্য

একসময়কার শক্তিশালী উসমানী সাম্রাজ্য (তুর্কি সাম্রাজ্য) ১৮শ শতাব্দীতে এসে দুর্বল হয়ে পরে। এসময় মহান উসমানি সাম্রাজ্যকে বলা হতো The Sick man of Europe. তখন ব্রিটিশ, ফরাসি ও রুশ সাম্রাজ্য ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়, এবং রুশ জার ১ম নিকোলাস চেষ্টা করেন, উসমানী সাম্রাজ্যকে দখল করে নিতে। তবে রাশিয়ার একার পক্ষে তা সম্ভব ছিলো না। তাই ব্রিটেনকে সাথে নিয়ে উসমানী সাম্রাজ্যে আক্রমণ করার প্রয়াস চালান জার ১ম নিকোলাস। তবে ব্রিটেন সরাসরি আক্রমণ না চালানোর পক্ষে ছিলো। এ অবস্থায় জার ১ম নিকোলাস ওঁত পেতে ছিলেন একটি সঠিক সুযোগের অপেক্ষায়, এবং অল্প কিছু দিনের মাঝেই ফ্রান্সের সাথে দ্বন্দের জের ধরে ১ম নিকোলাস সেই সুযোগ পেয়েও যান। এর ফলে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ। ১৮৫৩-৫৬ সালের সেই যুদ্ধ ইতিহাসে পরিচিত “ক্রিমিয়ার যুদ্ধ” নামে।

## ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

১৮৪৪ সালে রুশ জার ১ম নিকোলাস ইংল্যান্ড সফর করেন। সেখানে তিনি ব্রিটেনকে প্রস্তাব দেন, উসমানী সাম্রাজ্যকে দখল করে তা ব্রিটেন ও রাশিয়ার মাঝে ভাগ করে নিতে। কারণ, উসমানী সাম্রাজ্য গোরাপত্তনের পরে তার ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা পার করছিলো। আর রাশিয়া এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে উসমানীয়দের ধ্বংস করতে চাইছিলো। কিন্তু জার নিকোলাসের প্রস্তাবে ব্রিটেন এক প্রকার নিশ্চুপ ছিলো, আর এতেই জার ধরে নেন – নিরবতা সম্মতির লক্ষণ। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রিটেন রাশিয়ার এই পরিকল্পনায় যোগ



দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই রাশিয়া আর একা সাহস করে উসমানীয়দের সাথে যুদ্ধে জড়ায়নি। কিন্তু জার ১ম নিকোলাস সবসময় একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে সেই সুযোগ আসে **৩য় নেপোলিয়ন** ফ্রান্সের ক্ষমতায় বসার পর।

ফরাসি বিপ্লবের পর খ্রিষ্টান বিশ্ব ও গোটা ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য অনেকাংশেই কমে এসেছিলো। ৩য় নেপোলিয়ন ক্ষমতায় এসেই চাইলেন সেই পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে। প্রথমেই তিনি মনোযোগী হলেন উসমানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকা ক্যাথলিক চার্চগুলোর ব্যাপারে। ফরাসি বিপ্লবের আগে উসমানী সাম্রাজ্যের ভেতরে থাকা সংখ্যালঘু ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ও চার্চগুলো ছিলো ফ্রান্সের দায়িত্বে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে অর্থোডক্স চার্চের প্রভাব বেশ বেড়ে যায়, আর অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের অভিভাবক হিসেবে ছিলো **রাশিয়া**। তাই দেখা গেলো, ১৮৫২ সালে ৩য় নেপোলিয়ন যখন উসমানী সুলতানকে চিঠি দিয়ে পুনরায় চার্চগুলোর নিয়ন্ত্রণ ফেরত চাইলেন, তখন রুশ জার এতে ভীষণ ক্ষুদ্ধ হন। শুরু হয় উসমানী সাম্রাজ্যের ভেতরে থাকা খ্রিষ্টান সমাজে রাশিয়া ও ফ্রান্সের প্রভাব বাড়ানোর প্রতিযোগিতা। এদিকে **উসমানী সুলতান ১ম আব্দুল মজিদ** পড়েন এক মহাবিপদে। তিনি ফ্রান্সের প্রস্তাব মেনে নিলে রুশরা নাখুশ, আবার রুশদের মেনে নিলে ফ্রান্স বিরক্ত। কিন্তু ফ্রান্সের দাবিটি ছিলো তুলনামূলক যৌক্তিক, কারণ বহু আগে থেকেই তারা ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের রক্ষার দায়িত্বে ছিলো। কিন্তু রুশ জার ফ্রান্সের কোনো প্রভাবই মানতে রাজি ছিলেন না, তিনি রাষ্ট্রদূত পাঠান সুলতান আব্দুল মজিদের কাছে। সুলতান রুশদের কিছু দাবি মেনেও নেন – অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণ রুশদের হাতে থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন। অন্যদিকে রুশদের আসল উদ্দেশ্যই ছিলো যুদ্ধে জড়ানো, তাই তারা সুলতানকে চাপ প্রয়োগ করে সবগুলো দাবি মেনে নেয়ার জন্য। কিন্তু আব্দুল মজিদ তাতে অস্বীকৃতি জানান – যদিও তিনি জানতেন, রুশ রাষ্ট্রদূতকে খালি হাতে ফেরত পাঠানো মানেই যুদ্ধ ঘোষণা করা। কিন্তু তাতে আব্দুল মজিদের কোনো ভয় ছিলো না, কারণ তার পেছনে ছিলো ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্য।

এদিকে যা ধারণা করা হয়েছিল, তাই সত্য হলো। **১৮৫৩ সালের জুলাই মাসে রুশরা আক্রমণ করে** বসলো উসমানীয়দের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঞ্চলে। ভিয়েনা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় আলোচনার কোনো পথই আর খোলা রইলো না। তাই উসমানীয়রাও একই বছর – **১৮৫৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধ ঘোষণা** করে।

#### ক্রিমিয়া যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কেনো জড়িয়েছিলো?

ফ্রান্স-রুশদের মধ্যে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের নিয়ে টানাটানির ব্যাপার তো জানা গেল। বাকি রইলো ব্রিটেন। রুশরা যদি উসমানীয়দের পরাজিত করে ইউরোপে প্রবেশ করতো, তবে ব্রিটেনের জন্য তারা হতো গলার কাঁটা। কারণ, ভারতীয় উপমহাদেশের কলোনিগুলোতে পৌছাতে যে পথগুলো ব্যবহৃত হতো, রুশরা উসমানীয়দের পরাজিত করে ঐ পথগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলে নিশ্চিতভাবেই ঐ পথগুলো অবরুদ্ধ করে দিত। ফলে ফ্রান্স ও ব্রিটেন ইউরোপে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে রুশদের ইউরোপে প্রবেশে বাধা দেয়। আর এই কাজটা সহজেই করা যায়, উসমানীয়রা যদি ইউরোপ আর রাশিয়ান সাম্রাজ্যের মাঝে দুর্বল ভাবে হলেও টিকে থাকে তবেই। ব্রিটেন-ফ্রান্স ছাড়াও ঐ অঞ্চলে তুর্কুপের তাস ছিলো **অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য**। বিবাদমান সবগুলো পক্ষই অস্ট্রিয়ার ঘনিষ্ট প্রতিবেশি হওয়ায় অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক একই কারণে **সার্ডিনিয়া ও ক্রুশিয়াও** প্রথমদিকে কোনো পক্ষে যোগ দেয়নি – তবে মৌন সমর্থন ছিলো ফ্রান্স-ব্রিটেন-উসমানীয় জোটের দিকে।

#### ক্রিমিয়ার চূড়ান্ত যুদ্ধ

১৮৫৩ সালের জুলাই মাস। রাশিয়া আক্রমণ করে দখল করে নেয় **উসমানী সাম্রাজ্যের মুলজডভিয়া ও ওয়ালাসিয়া অঞ্চল**। এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সুলতান আব্দুল মজিদ জার ১ম নিকোলাসকে একটি হুশিয়ারি পত্র দিয়ে দখলকৃত অঞ্চলগুলো মুক্ত করে দিতে বলেন, কিন্তু জার তাতে কোনো পাতাই দেয় নি। ফলে ১৮৫৩ সালের অক্টোবর মাসে উসমানীরা রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেই সাথে ব্রিটেন ও ফ্রান্সও যোগ দেয় যুদ্ধে। একাধিক ফ্রন্টে শুরু হয় যুদ্ধ। একদিকে **ওমর পাশার নেতৃত্বে উসমানীয়রা সিলিন্দ্রাতে** (বর্তমানে বুলগেরিয়ার অংশ) কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অন্যদিকে **কার্স শহরে** (বর্তমানে উত্তর তুরস্কের জেলা) উসমানীয়রা শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। তবে কার্সে রুশ নৌবাহিনীর কাছে Battle of Sinop (৩০ নভেম্বর, ১৮৫৩)-এ ধরাশায়ী হয় উসমানীয়রা।

১৮৫৩ সালের নভেম্বরে রাশিয়ার পরপর সাফল্যে নড়েচড়ে বসে ফ্রান্স-ব্রিটেন। ফলে ১৮৫৪ সালের জানুয়ারিতে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নৌবাহিনী এবং দুতই সিলেসরা ফ্রন্টের কাছাকাছি ভার্নাতে পৌঁছে যায়। সেই সাথে সফলভাবে বাণিজ্যিক পথগুলো অবরোধ করে অর্থনৈতিক চাপে ফেলে রাশিয়াকে। এরপর ফ্রান্স-ব্রিটেন-উসমানীয়দের সম্মিলিত মিত্রবাহিনী কৃষ্ণসাগরে রুশদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাটি **ক্রিমিয়ার সেবাস্তবপোলে** আক্রমণ করার নেয় এবং সেই অনুযায়ী শুরু হয় প্রস্তুতি।

**১৮৫৪ সালের সেপ্টেম্বর** মাসে সেবাস্তপোলে নোঞ্জর করে মিত্রবাহিনী – রুশবাহিনীও চেষ্টা করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। তবে মিত্রবাহিনী রুশদের পরাজিত করে Battle of Alma-তে। কিন্তু রুশরা এতো সহজে হেরে যাবার পাত্র ছিল না। একটু সময় নিয়ে সব গুছিয়ে তারাও পাল্টা আক্রমণ চালায়। Battle of Balaklava যুদ্ধে দারুণভাবে মনোবল ফিরে পায় রুশ বাহিনী – প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয় ব্রিটিশ বাহিনীর। এরপর রুশরা আরো কয়েকদফা আক্রমণ করলে ক্রিমিয়াতে বেশ বেকায়দায় পরে মিত্রবাহিনী। এসময় শুরুর্তে নিরপেক্ষ থাকা **সার্ডিনিয়া** সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় মিত্র জোটকে। তাদের পাঠানো সৈন্য ও সামরিক সহায়তা পেয়ে মিত্রবাহিনী ঘুরে দাঁড়ায়। টানা কয়েকমাস ধরে চলে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ।

এরই মাঝে **১৮৫৫** সালের মার্চে রুশরা একটি বড়ো ধাক্কা খায় – **জার ১ম নিকোলাস আকস্মিক ভাবে মারা যান**। ১ম নিকোলাসের পর ক্ষমতায় বসেন **জার ২য় আলেকজান্ডার**। নতুন জারের পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে নিজেকে প্রমাণ করা ছিলো বেশ কঠিন। অন্যদিকে মিত্রপক্ষের সামনে টিকেতেই পারছিলো না রুশ বাহিনী। **১৮৫৫** সালের শেষের দিকে ফরাসি বাহিনী **মালকুফ দুর্গে** রুশদের পরাজিত করলে ক্রিমিয়ার সেবাস্তোপোলেরও পতন হয়। ফলে রুশদের সামনে পিছু হটা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। তাই তারা সমঝোতার চেষ্টা করতে থাকে। যুদ্ধের মিত্রপক্ষ (উসমানীয়-ব্রিটেন-ফ্রান্স) যুদ্ধে ভালো অবস্থানে থাকলেও কোনো টাল-বাহানা ছাড়াই আলোচনায় বসতে রাজি হয়।

অবশেষে **১৮৫৬ সালের ৩০শ মার্চ প্যারিসে** একটি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয় ক্রিমিয়ার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রুশ যুদ্ধজাহাজ কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের বৈধতা হারায়। **উসমানী সাম্রাজ্যের মুলজডভিয়া ও ওয়ালাসিয়া অঞ্চল** থেকে সেনা প্রত্যাহার করে জার ২য় আলেকজান্ডার। সেই সাথে উসমানী সাম্রাজ্যের সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানরা পায় পূর্ণ অধিকার – সমাধান হয় ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স চার্চের সমস্যা।

এ যুদ্ধে কয়েক লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলো, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল রুশরা। তবে ক্রিমিয়া যুদ্ধের পরেই রুশ সাম্রাজ্যে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। জার ২য় আলেকজান্ডার বাতিল করেন **সার্জড বা ভুমিদাস প্রথা**। সেই সাথে একটি দেরিতে হলেও রাশিয়ায় শুরু হয় **শিল্প বিপ্লব**। আপাতদৃষ্টিতে ক্রিমিয়া যুদ্ধে রুশরা পরাজিত হলেও এ যুদ্ধের ফলে রুশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তনগুলো সূচিত হয়েছিল, আজকের আধুনিক রাশিয়া গড়ার পেছনে তার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

### ১ম বিশ্বযুদ্ধ

#### ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

বিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বিশ্বে এতো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিলো না। পৃথিবীর বেশিরভাগ স্থলভাগ কোনো না কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের দখলে ছিলো। এর মধ্যে ইউরোপের ব্রিটিশ, ফ্রান্স, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য এবং এশিয়ায় রাশিয়া, জাপান অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ ইউরোপ ও এশিয়া জুড়ে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় **অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অংশ কিংডম অব সার্ডিনিয়া ১৮৪৮ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়**। এর ৭ বছর পর ফ্রান্সের সামরিক সহায়তায় সার্ডিনিয়ার সামরিক বাহিনী অস্ট্রো-হাঙ্গেরিকে পরাজিত করে। সার্ডিনিয়ার এই সফলতা দেখে তার কিছু প্রতিবেশি রাজ্য **অস্ট্রো-হাঙ্গেরির ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে কিংডম অব ইতালি** হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই দুই পক্ষের মধ্যকার যুদ্ধটি ইতালির স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হয়। সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে এই অস্থিরতার সুযোগে উত্তরে অবস্থিত **পুশিয়া (জার্মানি)** রাজ্যের সেনাবাহিনী অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সীমান্তে ঢুকে পরে। ১৮৬৭ সালে শক্তিশালী **অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে ঐ সাম্রাজ্যের বিস্তির্ণ এলাকা নিয়ে নর্থ জার্মানি ফেডারেশন** নামক একটি রাষ্ট্র সাম্রাজ্য গড়ে তোলে **পুশিয়া**। ০৫ বছর পর এই ফেডারেশন প্রতিবেশী ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে থাকা দক্ষিণের জার্মানি রাজ্যগুলো দখল করে নেয়।

১৮৭১ সালে ফ্রান্সের শহর ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদে এক আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স জার্মানিকে ঐ রাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করে – এভাবে জার্মানি নামক একটি রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়। একীভূত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরেই জার্মানি নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিবিধ কার্যক্রম শুরু করে এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলে শক্তি বৃদ্ধির জন্য তৎকালীন রুশ এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে জার্মানি।



উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের মত এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিলো। ১৮৭৭ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রাণাধীন বলকান অঞ্চলে জনসাধারণের মাঝে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এ সুযোগে অটোম্যান (উসমানী) সাম্রাজ্যের চিরশত্রু হিসেবে পরিচিতি রাশিয়া বলকান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো উষ্ণে দিয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় অটোম্যান সাম্রাজ্যের ঐ অংশ ভেঙে মন্টেনেগ্রিয়, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, এবং রোমানিয়া নামক নতুন ৪টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বলকান অঞ্চলে রুশ হস্তক্ষেপের বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির মতো ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলো। ভবিষ্যতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ১৮৮০ সালে জার্মানি এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরি একটি সামরিক জোট গঠন করে।

এ সময় উত্তর আফ্রিকার তিউনিশিয়ায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রান্স এবং ইতালির মধ্যে কূটনৈতিক লড়াই শুরু হয়। ইতালির প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই তিউনিশিয়ায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে ফ্রান্স। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ফ্রান্সের চিরশত্রু জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সাথে হাত মেলায় ইতালি। এর ফলে দ্বিপাক্ষিক সামরিক জোটটি ত্রিপাক্ষিক জোটে পরিণত হয়।

ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর এবার বিশ্বের অন্যান্য মহাদেশের দিকে চোখ ফেরায় জার্মানি। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিক অনুমোদন পেতে ১৮৮৪ সালে বার্লিনে একটি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করে জার্মানি সরকার। “বার্লিন কনফারেন্স” নামে পরিচিতি ঐ সম্মেলনে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মতো ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলোর শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু শর্ত আরোপ করা হয়। কিন্তু সেই শর্তগুলো না মেনেই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চল নিজেদের দখলে নিয়ে সেখানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে জার্মানি। প্রতিবেশি রাজ্যের এমন আগ্রাসী আচরণে আতঙ্কিত হয়ে ১৮৯২ সালে নিজেদের মধ্যে একটি গোপন সামরিক চুক্তি করে জার্মানির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ফ্রান্স ও রাশিয়া। এরপর ১৯০২ সালে ইতালির সাথে আরেকটি গোপন চুক্তি করে ফ্রান্স। ঐ চুক্তি অনুযায়ী পরস্পরের সাথে যুদ্ধে না জড়াতে একমত হয়েছিল রাজ্য দুটি।

অন্যদিকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোড়ালো করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে জার্মানি। এ লক্ষ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ১৯০৫ সালে বার্লিন থেকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের বাগদাদ শহর পর্যন্ত একটি রেললাইন নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রেললাইনের ফলে খনিজ তেল সমৃদ্ধ মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সাথে জার্মানির সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই অঞ্চলের খনিজ তেলের প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লোভী চোখে তাকিয়ে ছিলো। ফলে জার্মানির সাথে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠায় ব্রিটেনেরও টনক নড়ে ওঠে। একই সময় জার্মানি নিজেদের নৌবাহিনীর শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করে। ফলে বিশ্বের সমুদ্রপথগুলোয় ব্রিটেনের রয়াল নেভির একচ্ছত্র আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা তৈরী হয়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯০৭ সালে ফ্রান্স-রাশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর ব্রিটেন। ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া এই তিন পরাশক্তির মধ্যে গঠিত জোটটি “The Triple Entente” নামে পরিচিত। এভাবে বিংশ শতকের শুরুতে পুরো ইউরোপ দুটো মহাজোটে ভাগ হয়ে গিয়েছিলো।

একদিকে জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, ইতালি নিয়ে গঠিত Tripple Alliance.

অন্যদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়ার সমন্বয়ে গঠিত The Triple Entente.

Entente = ঐতাত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক কুটুম্বিতা বা মৈত্রী

বিংশ শতকের ২য় দশকের শুরু থেকেই বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে পরস্পরবিরোধী দুই মহাজোটের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অটোম্যান সাম্রাজ্য ভেঙে তৈরি হওয়া রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সার্বিয়া বলকান অঞ্চলে যুগোস্লাভিয়া নামে একটি স্লাভিক জাতিগোষ্ঠী গঠনে কাজ শুরু করে। স্লাভিয়া স্বাধীন হলেও এই জাতিগোষ্ঠীর অন্যতম অংশ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মত এলাকাগুলো অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের দখলে ছিলো। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এই দ্বন্দে সার্বিয়ার পেছনে অন্যতম উচ্চানিদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় রাশিয়া। এই দ্বন্দের জেরে ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান যুবরাজ ফ্রান্সোয়া ফার্দিনান্দ ও তার স্ত্রীকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে গ্যাভেরিলো প্রিন্সিপ নামক সার্বিয়ার এক সশস্ত্র বিপ্লবি। এর বদলা নিতে ২৮ জুলাই, ১৯১৪ বলকান অঞ্চলে সেনা অভিযান শুরু করে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি। ইতিহাসবিদরা এই দিনটিকেই ১ম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক শুরু বলে আখ্যা দিয়েছেন। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির এই হামলায় সমর্থন জানায় ততদিনে বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তিতে পরিণত হওয়া জার্মানি।

অপরদিকে সার্বিয়ার পাশে দাঁড়ায় প্রতিবেশি রাষ্ট্র রাশিয়া। অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় পশ্চিম সীমানায় বাড়তি সেনা মোতায়েন শুরু করে রাশিয়া। এর পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানি সেনাবাহিনী ০১ আগস্ট, ১৯১৪ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানি।



## ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী চুক্তিসমূহ

অক্ষশক্তি	মিত্রশক্তি (বিজয়ী দল)
জার্মানি	UK
অস্ট্রো-হাঙ্গেরি	ফ্রান্স
অটোম্যান সাম্রাজ্য	রাশিয়া
বুলগেরিয়া	সার্বিয়া
	USA
	বেলজিয়াম

১ম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের পর মিত্রশক্তি অক্ষশক্তির বিভিন্ন দেশের সাথে কিছু চুক্তি করেঃ

- মিত্রশক্তি – জার্মানিঃ ২য় ভার্সাই চুক্তি – ২৮ জুন, ১৯১৯
- মিত্রশক্তি – অস্ট্রিয়াঃ সেন্ট জার্মানি চুক্তি – ১৯১৯
- মিত্রশক্তি – বুলগেরিয়াঃ নিউলি চুক্তি – ১৯১৯
- মিত্রশক্তি – হাঙ্গেরিঃ ট্রেইনন চুক্তি – ১৯২০
- মিত্রশক্তি – অটোম্যান সাম্রাজ্যঃ সেব্রেস চুক্তি – ১০ আগস্ট, ১৯২০
- মিত্রশক্তি – আধুনিক তুরস্কঃ লুজান চুক্তি – ২৪ জুলাই, ১৯২৩

## ২য় ভার্সাই চুক্তি

১ম বিশ্বযুদ্ধে আহত- ২২ মিলিয়ন; নিহত- ২০ মিলিয়ন মানুষ। ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তিটি ছিল ভীষণ একপেশে। পরাজিত জার্মানিকে রীতিমত চাপ প্রয়োগ করে ইচ্ছামত শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। তবে আপামর জার্মানরা সেই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। সেই সাথে ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রতিনিধিদের জাতীয় বেঈমান বলেও আখ্যায়িত করা হয়। এই অসন্তোষ-অসম চুক্তি মাত্র ২০ বছরের মধ্যে রচনা করে আরও একটি মহাযুদ্ধ – ২য় বিশ্বযুদ্ধ।

### প্রেক্ষাপটঃ

এপ্রিল, ১৯১৭ – ১ম বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আমেরিকা। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে জার্মানি সরকার আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের কাছে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানায়, এবং উইলসন এই প্রস্তাবে **ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া** ব্যক্তি করেন। ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন কংগেসে উড্রো উইলসন ১৪টি দফা উত্থাপন করেন যা ইতিহাসে **“১৪ দফা”** হিসেবে পরিচিতি – এটি ছিল ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা। এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দফাঃ

- ইউরোপে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পোষাতে জার্মানির কাছে ক্ষতিপূরণ আদায়
- স্বাধীন পোল্যান্ড রাষ্ট্র গঠন
- ইতালির সীমানা পুনঃনির্ধারণ
- বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **“জাতিগুঞ্জ”** গঠন

কিন্তু কংগ্রেস সেটার অনুমোদন দেয়নি এবং ১ম বিশ্বযুদ্ধে জয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা মিত্রবাহিনী এই ভারসাম্যপূর্ণ চুক্তি মেনে নেয়নি। মিত্রশক্তি চাচ্ছিলো, জার্মানির কাছে সর্বোচ্চ স্বার্থ হাসিল করতে। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শান্তি সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি যোগ দেয়।

**“যুদ্ধ পরবর্তী অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির মধ্যকার শান্তি চুক্তি নির্ধারণ”** প্যারিস শান্তি সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলেও অক্ষশক্তির কোনো দেশকে ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। এমনকি রাশিয়াকেও এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয় নি, কারণ – ১ম বিশ্বযুদ্ধে Big Four (ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, আমেরিকা) প্যারিস শান্তি চুক্তিতে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল এবং বাকি ৩২টি দেশকে প্রায় লোক দেখানোর স্বার্থেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো।

আমেরিকা ১ম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যোগ দিয়েছিল, ইতালি শুরুতে নিরপেক্ষ ছিল। অন্যদিকে রাশিয়ায় **বলশেভিক বিপ্লব** সফল হওয়ায় যুদ্ধের শেষদিকে রাশিয়া নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে – অর্থাৎ শুধুমাত্র ব্রিটেন এবং ফ্রান্স শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে গিয়েছিলো। অবশ্য এর জন্য তারা সুবিধাও পেয়েছিলো। মিত্রশক্তির দেশগুলোর মধ্যে স্বার্থ হাসিলের মত-পার্থক্য সত্ত্বেও প্যারিস শান্তি চুক্তিতে **ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে** এবং জার্মানির উপর অন্যায় ভাবে স্বেচ্ছাচারী শর্ত আরোপ করে।

**আমেরিকা চেয়েছিলঃ** জার্মানির কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হোক, কিন্তু ইউরোপে যাতে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি না হয়।

**ফ্রান্স চেয়েছিলঃ** জার্মানি-ফ্রান্স প্রতিবেশি রাষ্ট্র হওয়ায় এবং তাদের দ্বন্দের ইতিহাস অনেক পুরনো হওয়ায় ফ্রান্স চেয়েছিল এমন কিছু শর্ত আরোপ করতে, যাতে জার্মানি ভবিষ্যতে আর মাথা তুলে দাড়াতে না পারে।

**ব্রিটেনের চাওয়াঃ** জার্মানির সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকায় ব্রিটেন জানতো, জার্মানি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রভাব ব্রিটেনের বাজারেও পরবে। তাই শর্তের দিক থেকে ব্রিটেন কিছুটা নমনীয় ছিল।

- ⇒ **১৯১৯ সালের ২৮ জুন** – জার্মানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ফ্রান্সে। মিত্রশক্তি ও জার্মানি মুখোমুখি হয় প্যারিসের অদূরে ভার্সাই প্রাসাদের মিরর হলে। জার্মানি ভেবেছিল, উড্রো উইলসনের ১৪ দফা বা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে হবে যুদ্ধ পরবর্তী শান্তি চুক্তি। কিন্তু তাদের ঐ ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে **প্যারিস শান্তি সম্মেলনে নির্ধারিত শর্তগুলো জানিয়ে দেয়া হয় জার্মানিকে**। জার্মানি এই শর্তগুলো মেনে নিতে বাধ্য হয়, যদিও এটি তাদের জন্য ছিল চরম অপমানজনক।

**ভার্সাই চুক্তিটি ছিল ২০০ পৃষ্ঠার – ৪৩৯টি ধারা ছিল তাতে। এর মধ্যে কিছু ধারাঃ**

- যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে জার্মানিকে **৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** দিতে হবে;
- ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে **“এলসাস লওরিন”** নামক একটি অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল জার্মানি, সেটি ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দিতে হবে;
- পোল্যান্ড ও যুগোস্লাভাকিয়া নামক দুটো দেশের স্বাধীনতার বিষয়টি উঠে আসে এই চুক্তিতে।** সেই সাথে জার্মানি থেকে আলাদা করে **অস্ট্রিয়াকে** স্বাধীনতা দিতে হবে;
- সারা বিশ্বে জার্মানির যত কলোনি ছিল, সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় ব্রিটেন ও ফ্রান্স।** দক্ষিণ আফ্রিকার যেসব অঞ্চল জার্মান নিয়ন্ত্রিত ছিল, সেগুলো দক্ষিণ আফ্রিকাকে হস্তান্তর করতে হবে;
- জার্মানি তাদের ১০ লক্ষ সেনাবাহিনী **০১ লক্ষে** নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়। এই সেনাবাহিনী শুধু জার্মানির অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষায় কাজ করবে। জার্মানি অন্য কোন দেশকে আক্রমণ করতে পারবে না;

- বিলুপ্ত করে দেয়া হয় জার্মানির বিমান বাহিনীকে। নৌবাহিনীর সংখ্যা ১৫ হাজারে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়। নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয় সাবমেরিন ও ভারী অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহারে। এক্ষেত্রে জার্মানি কোনো অস্ত্র আমদানি বা রপ্তানি করতে পারবে না;
- এই সকল শর্ত জার্মানি মানতে বাধ্য, তার নিশ্চয়তা সরূপ **রাইম নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল মিত্রপক্ষের দেশগুলোর হাতে ১৫ বছরের জন্য** দিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা সেখান থেকে জার্মানিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, বলা হয় – “জার্মানির জন্যই ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে”- যা সত্য নয়। স্পষ্টতই যুদ্ধ শুরু করেছিল **অস্ট্রো-হাঙ্গেরি এবং সার্বিয়া**। রাশিয়া এরপর যুদ্ধে জড়ানোর ঘোষণা দেয়, তারপর জার্মানি। তাই শুধুমাত্র জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করা ছিলো স্বেচ্ছাচারিতা, যা জার্মানি জনগণ কখনো মেনে নিতে পারেনি।

২য় ভার্সাই চুক্তি জার্মানি জাতিকে চরম অসন্তোষে ফেলে দেয় যা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে **হিটলার নাৎসি বাহিনীর** মত কটর জাতীয়তাবাদী দল গড়ে তুলতে পারে। হিটলার ১৯৩৩ সালে জার্মানির ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং ১৯৩৫ সালে ভার্সাই চুক্তি বাতিল করে – যা ২য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

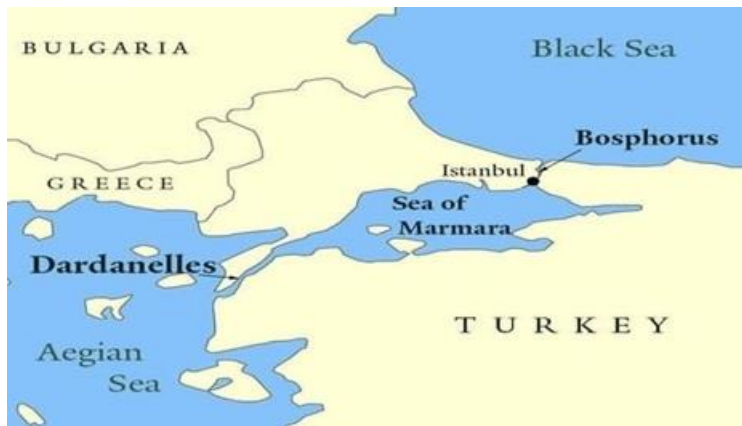
ইতিহাসবিদেরা মনে করেন, “ভার্সাই চুক্তির মত একপাক্ষিক চুক্তি না হয়ে উড্রো উইলসনের ১৪ দফা মেনে নিয়ে যুদ্ধবিরতি হলে হিটলার ও তার নাৎসি বাহিনীর উত্থান হতো না, সূচনা হতোনা ২য় বিশ্বযুদ্ধের”।

## সেব্রেস চুক্তি (Treaty of Sevres)

- ⇒ রাশিয়া এবং আমেরিকা মিত্রশক্তির পক্ষে থাকলেও সেব্রেস চুক্তিতে তারা অংশ নেয় নি, এর পিছনে তাদের ব্যক্তিগত কারণ রয়েছেঃ **রাশিয়ার কারণঃ** USSR, ১৯১৮ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সাথে **“Brest-Litovsk”** চুক্তি করায় নতুন করে আর কোনো চুক্তি করতে চায়নি তারা। **আমেরিকার কারণঃ** আমেরিকা চেয়েছিলো, অটোম্যান সাম্রাজ্যের কাছে আর্থিক জরিমানা দিয়ে আমেরিকা তাদের অর্থনীতির যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি মেটাবে।
- ⇒ এই চুক্তির মাধ্যমে **আর্মেনিয়াকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি** দেয়া হয়।

### সেব্রেস চুক্তির অর্থনৈতিক শর্তঃ

- ⇒ The financial control included approving and supervising the **“National Budget”**, implementing financial laws and regulations, and totally controlling the **“Ottoman Banks”**.
- ⇒ The Empire was required to **grant freedom of transit to people, goods, vessels, etc.** passing through her territory; and goods in transit were to be **free of all customs duty**.
- ⇒ **দার্দানালিস প্রণালী** সবসময় খোলা থাকবে এবং সব দেশের সব ধরনের জাহাজ অবাধে চলাচল করতে পারবে। প্রণালীর আশেপাশের কোনো ধরনের যুদ্ধ করা যাবে না।



### সেব্রেস চুক্তির সামরিক শর্তঃ

- ⇒ The Ottoman Army was to be restricted to 50,700 men;
- ⇒ The Ottoman Navy could only maintain 07 sloop and 06 torpedo boats;
- ⇒ The Ottoman State was prohibited from creating any Air Force;
- ⇒ ১ম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অটোম্যান সাম্রাজ্য আর্মেনিয়া অঞ্চলে যে গণহত্যা চালিয়েছিলো, তার বিচার করতে হবে।

### Foreign Zones of Influence:

অটোম্যান সাম্রাজ্যের **ভেতরের কিছু অঞ্চল মিত্রশক্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে** থাকবে।

- **ফ্রান্সঃ** দক্ষিণ-পূর্ব অ্যানাতলিয়া এবং আরো কিছু অঞ্চল;
- **ইতালিঃ** দোদেকেনেস দ্বীপ ও আশেপাশের অঞ্চল;
- **গ্রিসঃ** ইস্তাম্বুল শহরের পাশের অঞ্চল **“থ্রেস”** এবং মর্মর সাগরের দ্বীপগুলো।

### Mandate:

বর্তমানে **তুরস্কের বাইরে যেসব দেশ অটোম্যান সাম্রাজ্যের দখলে** ছিলো, সেগুলো League of Nations-এর পক্ষ থেকে মিত্রশক্তির দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ করবেঃ

- ব্রিটিশদের ম্যান্ডেটঃ **ইরাক (মেসোপটেমিয়া), ফিলিস্তিন, জর্ডান**
- ফ্রান্সের ম্যান্ডেটঃ **সিরিয়া, লেবানন**



Kingdom of Hejaz:

১৯১৬ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে একটে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় **হেজাজ**। সেন্দ্রেস চুক্তির মাধ্যমে এই দেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, **মুসলমানদের পবিত্র শহর “মক্কা” ও “মদিনা”** এই দেশের অধীনে ছিলো।

Kingdom of Hejaz-এর রাজধানীঃ ১৯১৬-২৪: **মক্কা** এবং ১৯২৪-২৫: **জেদ্দা**

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে Nejd (নেজ – বর্তমানে সৌদি আরব) সালতানাতের সুলতান **“ইবনে সৌদ”** Kingdom of Hejaz দখল করে নেয়।

সেন্দ্রাস চুক্তির পরিণতিঃ

অটোম্যান সাম্রাজ্য এই চুক্তি মেনে নিলেও চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলাকালীন অটোম্যান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিলো (১৯১৯-২৩)। স্বাধীন তুরস্কের নেতা **“কামাল আতাতুর্ক”** এই চুক্তি বাতিল করে। ফলে এই চুক্তি কখনো আলোর মুখ দেখেনি।

এর ফলে **কামাল আতাতুর্কের** সাথে মিত্রশক্তির **১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই – লুজান চুক্তি** নামে আরেকটি চুক্তি হয়, যা সেন্দ্রেস চুক্তিরই পরিমার্জিত রূপ।

লুজান চুক্তি (Treaty of Lausanne)

- ⇒ সেন্দ্রেস চুক্তিঃ মিত্রপক্ষ – অটোম্যান সাম্রাজ্য -> ১০ আগস্ট, ১৯২০ -> **ফ্রান্সের সেন্দ্রেস** শহরে
- ⇒ **লুজান চুক্তিঃ** মিত্রপক্ষ – নতুন স্বাধীন তুরস্ক -> **২৪ জুলাই, ১৯২৩** -> **সুইজারল্যান্ডের লুজান** শহরে

লুজান চুক্তি ও সেন্দ্রেস চুক্তির তুলনামূলক আলোচনাঃ

সেন্দ্রেস চুক্তি	লুজান চুক্তি
সেন্দ্রেস চুক্তি অনুযায়ী, অটোম্যান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি মিত্রশক্তির দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ করবে।	লুজান চুক্তি অনুযায়ী, তুরস্কের অর্থনীতিতে মিত্রশক্তি কোনো হস্তক্ষেপ করবে না।
সেন্দ্রেস চুক্তি অনুযায়ী, অটোম্যান সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে সব সময় সব ধরনের জাহাজ সব ধরনের মালামাল পরিবহণ করতে পারবে, তবে সেগুলো কোনো কর আরোপ করা যাবে না।	লুজান চুক্তিতে এই শর্ত বাতিল করা হয়।
সেন্দ্রেস চুক্তি অনুযায়ী, তুরস্কের বসফরাস প্রণালী (কৃষ্ণ সাগর+মর্মর সাগর) এবং দার্দানেলিস (dardanelles) প্রণালী (মর্মর সাগর+অ্যাজিয়ান সাগর)-তে বাণিজ্যিক ও যুদ্ধ জাহাজ সহ সব ধরনের জাহাজ চলাচল করতে পারবে।	লুজান চুক্তি অনুযায়ী, শান্তিপূর্ণ সময়ে প্রণালীগুলো দিয়ে শুধু বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করতে পারবে এবং একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করা হবে যার প্রধান হবে একজন তুর্কি, এবং এই কমিটির কাজ হবে প্রণালীগুলো দেখাশোনা করা। তবে প্রণালীর এলাকায় তুরস্কের সেনাবাহিনী প্রবেশ করতে পারবে না।
সেন্দ্রেস চুক্তি অনুযায়ী, অটোম্যান সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির উপর অনেক ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিলো।	লুজান চুক্তিতে সেসব নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হয়।
সেন্দ্রেস চুক্তিতে Foreign Zones of Influence অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।	লুজান চুক্তিতে এটি বাদ দেয়া হয়।
সেন্দ্রেস চুক্তিতে আর্মেনিয়ার গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।	লুজান চুক্তিতে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।
সেন্দ্রেস চুক্তিতে আর্মেনিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।	১৯২০ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর্মেনিয়া দখল করে নেয়ায় লুজান চুক্তিতে এটি বাতিল করা হয়। বি.দ্র.: ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আর্মেনিয়া স্বাধীন হয়।
সেন্দ্রেস চুক্তির মাধ্যমে East Thrace (বর্তমান ইস্তাম্বুল ও আরও কিছু অঞ্চল) এবং Imbros Island এবং এর আশেপাশের অঞ্চল গ্রিসের নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়েছিল।	লুজান চুক্তিতে এটি বাতিল করা হয়, ফলে বর্তমানে ইস্তাম্বুল তুরস্কের অংশ
সেন্দ্রেস চুক্তি অনুযায়ী কুর্দি জনগোষ্ঠীর জন্য কুর্দিস্তান নামক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।	লুজান চুক্তিতে এটি বাতিল করা হয়।
১ম বিশ্বযুদ্ধের আগে অটোম্যান সাম্রাজ্য যেসব অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল, সেন্দ্রেস চুক্তিতে Mandate-এর মাধ্যমে সেসব অঞ্চল ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়েছিল।	<b>লুজান চুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়নি</b>  [Mandate অনুযায়ী ফিলিস্তিন ব্রিটেনের অধীনে ছিল, এবং ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের কিছু অংশ নিয়ে ইসরায়েল নামক একটি ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
সেন্দ্রেস চুক্তি অনুযায়ী, আরব উপদ্বীপে Kingdom of Hejaz-কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল।	<b>লুজান চুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকে</b>
লুজান চুক্তির আগে, গ্রিস এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের মাঝে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিক বিনিময় হয়েছিল। (গ্রিসের মুসলমান তুরস্কে, তুরস্কের খ্রিষ্টান গ্রিসে)	যারা ঐ বিনিময়ের পরও সংখ্যালঘু হিসেবে থেকে গিয়েছিল, <b>লুজান চুক্তি অনুযায়ী তাদের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল।</b>

- ⇒ তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুরস্ক – গ্রিস, আর্মেনিয়া ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করলে লুজান চুক্তির মাধ্যমে আজকের আধুনিক তুরস্কের জন্ম হয়।
- ⇒ তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তুরস্ক – সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, এবং আর্মেনিয়ার সাথে পৃথক পৃথক চুক্তি করেছিল।

## বাল্টিক রাষ্ট্র



বাল্টিক সাগরের পূর্ব দিকের ৩টি রাষ্ট্রকে একত্রে বাল্টিক রাষ্ট্র বলা হয়ঃ

\* এস্তোনিয়া (রাজধানীঃ ট্যালিন)

\* লাডভিয়া (রাজধানীঃ রিগা)

\* লিথুনিয়া (রাজধানীঃ ভিলনিয়াস)

\*\* তবে বাল্টিক সাগরের পাশের অন্যান্য দেশও বাল্টিক রাষ্ট্র নামে পরিচিত।

### The Council of the Baltic Sea States

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলোর মিলেমিশে থাকার জন্য গঠন করে এই সংগঠন। ২০২২ সালের আগ পর্যন্ত এই সংগঠনের সদস্য ছিল ১১ টি রাষ্ট্র। তবে ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনকে আক্রমণ করার পর রাশিয়াকে এই সংগঠন থেকে বের করে দেয়া হয়।

বর্তমান ১০টি রাষ্ট্রঃ ১. এস্তোনিয়া ২. লাডভিয়া ৩. লিথুনিয়া ৪. আইসল্যান্ড ৫. নরওয়ে ৬. সুইডেন ৭. ডেনমার্ক ৮. ফিনল্যান্ড ৯. পোল্যান্ড ১০. জার্মানি

## স্ক্যান্ডেনেভিয়ান রাষ্ট্র



সাধারণত স্ক্যান্ডেনেভিয়ান রাষ্ট্র বলতে আমরা ৫টি দেশকে বুঝিঃ **FINDS** -> ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন

স্ক্যান্ডেনেভিয়ান পেনিনসুলাঃ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক

নর্ডিক+স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশঃ ফিনল্যান্ড (আগে সুইডেনের অংশ ছিল), আইসল্যান্ড (আগে ডেনমার্কের অংশ ছিল)

⇒ **নর্ডিক দেশঃ** ইউরোপ মহাদেশের উত্তর গোলাধ্বের কাছাকাছি দেশগুলোকে নর্ডিক দেশ বলে।



## বলকান রাষ্ট্র



বলকান একটি তুর্কি শব্দ, যার অর্থঃ **পর্বত**। বলকান পর্বতমালার দক্ষিণ দিকের রাষ্ট্রসমূহকে বলকান রাষ্ট্র বলা হয়।

কিছু বলকান রাষ্ট্রঃ **তুরস্ক, গ্রিস, আলবেনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগভিনা, বুলগেরিয়া, মন্টিনিগ্রো, মেসিডোনিয়া, কসোভো, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, রোমানিয়া, মলদোভা**

এই রাষ্ট্রগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ, কিন্তু এদের সামরিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। তাই এই রাষ্ট্রগুলোকে একত্র করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় **যুগোস্লাভিয়া** (কৃত্রিম রাষ্ট্র) গঠন করে যা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ভেঙে যায়।

যুগোস্লাভিয়া গঠনঃ **১৯১৮**;      যুগোস্লাভিয়ার পতনঃ **১৯৯২**

## মহামন্দা (The Great Depression)

সময়কালঃ **১৯২৯-৩৯**

১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০-২৯ এই দশ বছর আমেরিকা তার উন্নতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল, তাই এই দশককে আমরিকার ইতিহাসে Roaring Twenties (20’s) নামে অবিহিত করা হয়। এসময় আমেরিকার অর্থনীতি এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে, উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সকলেই শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে লাভবান হয়েছিল।

১ম বিশ্বযুদ্ধের আগে পৃথিবীর বেশিরভাগ অঞ্চল ব্রিটিশ, ফ্রান্স বা উসমানী সাম্রাজ্যের দখলে ছিল। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকায় ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা ইউরোপের দেশগুলোকে প্রচুর অস্ত্র, খাদ্য ও অন্যান্য রসদ সরবরাহ করেছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধবিক্ষস্ত দেশগুলোকে খাদ্যপণ্য এবং প্রচুর ঋণ দিয়েছিল আমেরিকা। এসব কিছুর বিনিময়ে আমেরিকা স্বর্ণ নিয়েছিল দেশগুলোর কাছ থেকে। ফলে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমেরিকার স্বর্ণের মজুত ফুলে ফেঁপে ওঠে।

ইউরোপের চাহিদা মাথায় রেখে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বাড়ায় আমেরিকা। সেই সাথে আমেরিকার শহরগুলোতে গড়ে ওথে প্রায় ২৫ হাজার ব্যাংক যা আমেরিকার কৃষি ও শিল্প খাতে সহজ শর্তে ঋণ দিতে থাকে। এমন আর্থিক স্বচ্ছলতা আগে কখনো দেখেনি আমেরিকানরা।

**১ম বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকার জিডিপিঃ ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার**

**১ম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার জিডিপিঃ ৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার**

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপের ভঙ্গুর দশায় আমেরিকা একচেটিয়া ভাবে রপ্তানি ও ঋণ সহায়তা করতে থাকে ইউরোপের দেশগুলোকে। অন্যদিকে আমেরিকা নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজিয়ে ফেলে। যার ফলে চরম অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় আমেরিকাতে।

এরকম অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ব্যাংকগুলোর সহজ শর্তে লাগামহীন ঋণ আমেরিকার নাগরিকদের বিলাসিতার দিকে ঠেলে দেয়। এক্ষেত্রে আমেরিকার **রিপাবলিকান সরকার** (বর্তমানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প একজন রিপাবলিকান নেতা) কোনো হস্তক্ষেপ করেনি।

### পতন — মহামন্দা

১ম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার অর্থনীতির বেশিরভাগ নির্ভর করতো ইউরোপের বাজারের উপর। যুদ্ধের পর প্রথম দিকে ইউরোপের দেশগুলোর আমেরিকার কাছ থেকে ঋণ সহায়তা এবং আমদানি করলেও পরবর্তীতে তারা স্বনির্ভর হতে শুরু করে। এতে সংকুচিত হতে থাকে আমেরিকার কৃষি রপ্তানি খাত। রপ্তানি কমে যাওয়ায় আমেরিকার অনেক কৃষি পণ্য নষ্ট হয়ে যায়, এতে করে সর্বসান্ত হয়ে পরে আমেরিকার অনেক কৃষক।

আমেরিকার ব্যাংকগুলো ছাড়াও অনেক দালাল চক্র আমেরিকার নাগরিকদের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের জন্য এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য ঋণ দিতো। ইউরোপে রপ্তানি কমে যাওয়ার আশঙ্কা করে তারা ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তারা কৃষকদের প্ররোচনা দিতে থাকে, যাতে কৃষকরা শেয়ার বিক্রি করে করে হলেও তাদের ঋণ পরিশোধ করে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক “ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক” ব্যাপারটি আন্দাজ করতে পেরে সরকারকে জানিয়েছিল, কিন্তু সরকার ভেবেছিলো, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে দেশের নাগরিকরা অর্থ উপার্জন করছে, তাই সরকার এই ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত করেনি।

**২৪ অক্টোবর, ১৯২৯** — এই দিনে আসে ১ম ধাক্কা। প্রায় ১২ মিলিয়ন শেয়ার বিক্রি হয়ে যায়, ফলে শেয়ার বাজারে আকস্মিক দরপতন ঘটে। ইতিহাসে এই দিনটিকে বলা হয় **Black Thursday** (কালো বৃহস্পতিবার)। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য, এবং পরবর্তীতে বেশি লাভের আশায় অনেকে এই শেয়ারগুলো কিনে নেয় এবং অনেক ব্যাংক শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে। কিন্তু কিছুতেই কোনো লাভ হয়নি।

**২৯ অক্টোবর, ১৯২৯** — এই দিনে আসে ২য় ধাক্কা। প্রায় ১৬ মিলিয়ন শেয়ার বিক্রি হয়। এবার যে দরপতন হয়, সেটা থেকে আমেরিকার শেয়ার বাজার (ওয়াল স্ট্রিট) আর ঘুরে দাড়াতে পারেনি। এই দিনটি ইতিহাসে **Black Tuesday** (কালো বুধবার) নামে পরিচিত।

শেয়ার মার্কেটের পতন ও রপ্তানি কমে যাওয়ায় একে একে বন্ধ হতে থাকে বিভিন্ন ব্যাংক ও শিল্প-কারখানা। কর্মসংস্থান হারিয়ে প্রায় ১.৫ কোটি বেকার হয়ে যায়। সমাজে বেড়ে যায় অপরাধপ্রবণতা, আত্মহত্যা, পতিতাবৃত্তির মত সামাজিক সমস্যা।

The Great Depression-এর প্রভাব পরে আমেরিকার রাজনৈতিক মহলেও। টানা তিন বার ক্ষমতায় থাকা **রিপাবলিকরা** ক্ষমতা হারায়, **নতুন রাষ্ট্রপতি হন ডেমোক্রট নেতা ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট**। তিনি ক্ষমতায় এসে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ব্যাংকখাত সংস্কার, শেয়ারবাজার পুনর্গঠন-এর মত দিক গুলোতে মনোনিবেশ করেন। রুজভেল্টের এই পদক্ষেপগুলো পরবর্তীতে আমেরিকাকে এই মহামন্দা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করে।

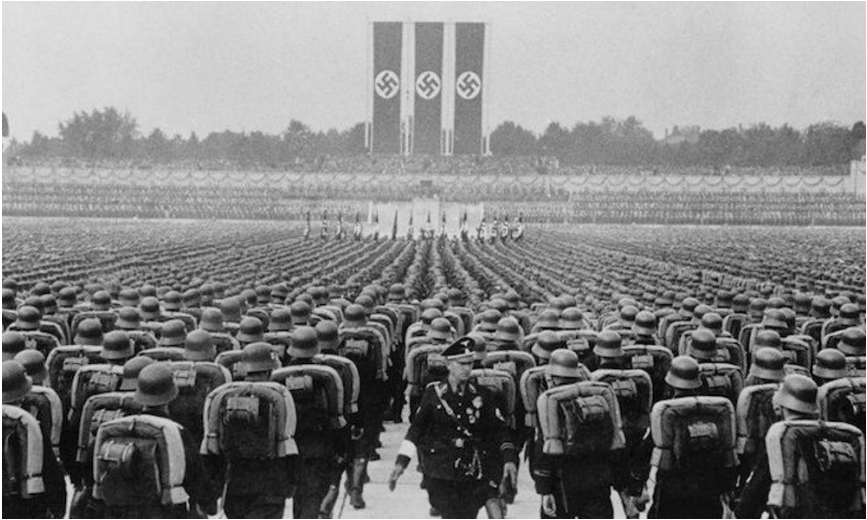
**মিউনিখ চুক্তি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ**



পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়াবহতম যুদ্ধগুলোর মধ্যে অন্যতম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রায় ছয় বছরব্যাপী পুরো পৃথিবীকে নরক বানিয়ে রেখেছিল এই যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্রের মতো ভয়াবহ অস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে এর। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণকে চিহ্নিত করা হলেও এর পেছনে অনেকগুলো পরোক্ষ কারণ বিদ্যমান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির মাধ্যমেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি রচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশক বিভিন্ন ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট হাজির করে। ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি থেকে ১৯৩৯ সালের জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্যবর্তী কয়েকটি ঘটনাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পেছনের অনেকগুলো পরোক্ষ কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, ১৯৩৮ সালে ইউরোপের চার পরাশক্তির (ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি) মধ্যে হওয়া মিউনিখ এগ্রিমেন্ট।

কী ছিল এই মিউনিখ চুক্তি, এর পটভূমিই বা কী ছিল এবং কীভাবেই বা এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পেছনে ভূমিকা রেখেছিল?

১৯৩০ এর দশক ছিল ইউরোপীয় রাজনীতির যুগান্তকারী সময়। এ সময় ইউরোপের রাজনীতিতে দ্রুত পটপরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ক্ষমতায় আসে উগ্র নাৎসিরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানির হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বন্ধপরিকর হয় তারা। নাৎসিদের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক দুঃসময় কাটিয়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক সাফল্যও লাভ করে দেশটি।



উগ্র জাতীয়তাবাদী নাৎসিরা সম্প্রসারণ নীতির মাধ্যমে খার্ড রাইখ গঠনের পরিকল্পনা করে;

১৯৩৮ সাল, মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছর। একটি বড় ধরনের যুদ্ধের অধিকাংশ লক্ষণ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। বছর দুয়েক পূর্বেই ১৯৩৬ সালে জার্মানি ও জাপান ‘এন্টি-কমিন্টার্ন’ তথা সোভিয়েত বিরোধী জোট গঠন করেছে। সেই জোটে আবার ইতালিও যোগ দিয়েছে। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানে পুঁজিবাদী দেশগুলো আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিস্তার ঠেকাতে পশ্চিমা রা একত্রিত হতে থাকে। এদিকে জার্মানিও নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য উতলা হয়ে ওঠে।

বিশ্ব বিজয়ের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে নাৎসিরা অস্ট্রিয়াকে জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনা করে। জার্মানির আশেপাশে অবস্থিত জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলগুলো নিয়ে বৃহত্তর জার্মানি গঠনে উদগ্রীব হয়ে ওঠে নাৎসিরা। অস্ট্রিয়া ছিল জার্মানি ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের মধ্যে সেতুর মতো। অস্ট্রিয়াকে জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ বিজয়ের সম্ভাবনা দেখে নাৎসিরা। এছাড়া অস্ট্রিয়াকে সংযুক্তির মাধ্যমে পশ্চিমাদের বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন হিটলার।



এতো সহজে অস্ট্রিয়াকে সংযুক্তিকরণের ফলে বিশ্ববিজয়ে নাৎসিদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়;

১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার একত্রিকরণ নিষিদ্ধ ছিল। জার্মানি চেয়েছিল অস্ট্রিয়াকে সংযুক্তিকরণের পর পরাশক্তিদের প্রতিক্রিয়া দেখে পরবর্তী কৌশল অবলম্বন করতে। যেই কথা সেই কাজ! ১৯৩৮ সালের ১২ মার্চ জার্মানি ভার্সাই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে অস্ট্রিয়াকে সংযুক্ত করে নেয়। অস্ট্রিয়াকে সংযুক্তিকরণের পর পরাশক্তিগুলো একটু নিন্দা ছাড়া বড় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। পরাশক্তিগুলোর নীরবতা নাৎসিদের বেপরোয়া হতে সহযোগিতা করে। অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণের ফলে জার্মানির সামরিক শক্তি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বাস্তবক্ষেত্রে তাদের অবস্থানও শক্ত হয়েছে।



নাৎসিরা এবার চেকোস্লোভাকিয়ায় অবস্থিত জার্মান ভূখন্ডের দিকে নজর দেয়। চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তবর্তী বড় একটা অঞ্চল ছিল জার্মান ভাষাভাষী। চেকোস্লোভাকিয়ার উত্তরাঞ্চল সুডেনল্যান্ড নামে পরিচিত, যার অধিকাংশ বাসিন্দা জাতিগত জার্মান। নাৎসিরা এই অঞ্চলকে জার্মানির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে। নাৎসিরা এই ভূখন্ডকে জার্মানির সঙ্গে একত্রিকরণের জন্য উঠেপড়ে লাগে।



চেকোস্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরে সুডেনল্যান্ড অঞ্চল ছিল জাতিগত জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠ;

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য ভেঙে চেকোস্লোভাকিয়ার সৃষ্টি হয়। তখন নৃতাত্ত্বিকভাবে জার্মান সুডেনল্যান্ড অঞ্চলকে চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেখানে ৩০ লক্ষাধিক জার্মান বসবাস করতো।

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে নাৎসিদের ক্ষমতা গ্রহণের পর, তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সুডেনল্যান্ডের জার্মানদের মধ্যে বৃহত্তর জার্মান জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে নাৎসিরা সুডেনল্যান্ডে মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তোলে। নাৎসিরা সুডেনল্যান্ডের মিলিশিয়া বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করে। সুডেনল্যান্ডকে বৃহত্তর জার্মানির সঙ্গে একত্রিকরণের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৩৩ সালে সুডেনল্যান্ড জার্মান পার্টি (SDP) গঠিত হয়। এসডিপি ছিল মূলত নাৎসি পার্টির একটি শাখা। সুডেনল্যান্ডের জার্মানদের কাছে এসডিপি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গঠনের পর থেকেই দলটি সুডেনল্যান্ডকে জার্মানির নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা চালাতে থাকে। জার্মানি ও চেকোস্লোভাকিয়া উভয় দেশের কাছে সুডেনল্যান্ড ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণ ও শিল্পোন্নত সুডেনল্যান্ডের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। নাৎসিরা জার্মানির দক্ষিণাঞ্চলে মনোনিবেশ করে এবং হিটলার তার সেনাপতিদেরকে সুডেনল্যান্ডে আগ্রাসনের পরিকল্পনা শুরু করার নির্দেশ দেন।

হিটলার সুডেনল্যান্ড জার্মান পার্টির নেতা কোনারাদ হেনলিনকে সেখানে কৌশলে অস্থিরতা তৈরি করার নির্দেশ দেন। হিটলার চেয়েছিলেন হেনলিনের সমর্থকরা যেন সুডেনল্যান্ডে অস্থিরতা তৈরি করে, যাতে এই অজুহাতে জার্মান সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে সুডেনল্যান্ড দখল করে নিতে পারে যে, চেকোস্লোভাকিয়ান সরকার এই অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম।



সুডেনল্যান্ড জার্মান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কোনারাদ হেনলিন;

হেনলিনের অনুসারীরা সুডেনল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানায়। হিটলারের নির্দেশে সুডেনল্যান্ডে অবস্থিত নাৎসিদের অনুসারী মিলিশিয়া বাহিনী সেখানে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি করে। জবাবে চেকোস্লাভ সরকার সুডেনল্যান্ডে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে এবং সেখানে সামরিক আইন জারি করে। একপর্যায়ে সুডেনল্যান্ডে দাঙ্গা তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে হিটলারের নির্দেশে জার্মান বাহিনী চেকোস্লোভাকিয়া সীমান্তে জড়ো হয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

১৯৩৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জার্মানির ন্যুরেমবার্গ শহরে নাৎসি পার্টির এক সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে হিটলার সুডেন সংকট নিয়ে চেকোস্লোভাক সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। হিটলার চেকোস্লোভাক সরকারকে সুডেনল্যান্ডের জার্মানদের ধীরে ধীরে নির্মূল করতে চাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, জার্মানি সুডেনল্যান্ডের জার্মানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করবে, সেই সঙ্গে হিটলার সুডেনল্যান্ডকে জার্মানির কাছে হস্তান্তরের দাবি জানান।

সংকট বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধের ভয় ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আগ্রহী হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয় দেশ ইউরোপে নতুন কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং যেকোনো মূল্যে ইউরোপে একটি যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত তখনও শুকায়নি, এমন সময় নতুন কোনো যুদ্ধ ব্রিটেন ও ফ্রান্স চায়নি।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন সমস্যা সমাধানের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় তিনি একটি বৈঠকের অনুরোধ জানিয়ে হিটলারকে টেলিগ্রাম পাঠান। ১৯৩৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে জার্মানি গমন করেন। উক্ত বৈঠকে হিটলার দাবি করেন, চেকোস্লোভাকিয়া সরকার সুডেনল্যান্ডের জার্মানদের উপর অত্যাচার করছে, সেই সঙ্গে হিটলার সুডেনল্যান্ডকে জার্মানির কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।



ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন (মাঝখানে টুপি ও ছাতা হাতে) হিটলারের সঙ্গে বৈঠক করতে জার্মানি গমন করেন;

স্বাভাবিকভাবেই হিটলারের এমন দাবি চেম্বারলিন তৎক্ষণাৎ মেনে নিতে পারেন না, এর জন্য তাকে লন্ডনে মন্ত্রিসভার সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। চেম্বারলিন হিটলারের কাছ থেকে কয়েকদিনের সময় নেন এবং এই সময়ের মধ্যে হিটলারকে কোনো সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। হিটলার এই সময়ের মধ্যে কোনো সামরিক অভিযান না করতে রাজি হলেও তিনি তার জেনারেলদের নিয়ে সামরিক পরিকল্পনা সাজাতে থাকেন।

চেম্বারলিন লন্ডনে ফিরে এসে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক ডাকেন। মন্ত্রিসভা সুডেনল্যান্ডের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফরাসি সরকারের সাথে যোগাযোগ করলে ফরাসি সরকারও চেম্বারলিনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায়।

১৯৩৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ও ফরাসি রাষ্ট্রদূতরা চেকোস্লোভাক সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সুডেনল্যান্ডের যে অঞ্চলগুলোতে ৫০ শতাংশের বেশি জার্মান জনসংখ্যা বাস করে সেই অঞ্চলগুলো ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। মিত্রদের কাছ থেকে সমর্থন না পেয়ে চেকোস্লোভাক সরকারকে এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এমন সিদ্ধান্ত না চাওয়া সত্ত্বেও চেকোস্লোভাক সরকার মানতে বাধ্য হয়।



২৩ সেপ্টেম্বর পুনরায় চেম্বারলিন (বামে) ও হিটলার (ডানে) বৈঠকে মিলিত হন;

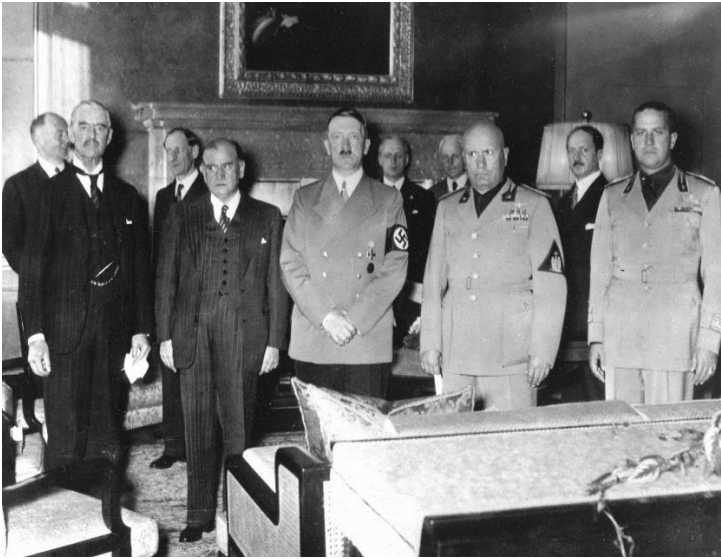
চেকোস্লোভাক সরকারের কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে ২২ সেপ্টেম্বর চেম্বারলিন জার্মানিতে গিয়ে পুনরায় হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একটি সমাধানে পৌঁছাতে পেরেছেন বলে আশাবাদী ছিলেন চেম্বারলিন, কিন্তু সেখানে হিটলারের নতুন দাবি শুনে হতবাক হয়ে যান। হিটলার দাবি করেন, সুডেনল্যান্ডকে পুরোপুরিভাবে অধিকারের জন্য জার্মান সেনাবাহিনীকে অনুমতি দিতে হবে। সেই সঙ্গে সুডেনল্যান্ডে বসবাসরত অ-জার্মানদের সেখান থেকে বহিস্কার করতে হবে। তিনি আরো দাবি করেন, চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত পোলিশ ও হাঙ্গেরিয়ান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে যথাক্রমে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এরপর চেম্বারলিন লন্ডনে ফিরে আসেন। হিটলার ২৮ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টার মধ্যে জার্মানির কাছে সুডেনল্যান্ডকে হস্তান্তরের সময়সীমা বেধে দেন, অন্যথায় যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার হুমকি দেন। পরবর্তীতে ইতালির মুসোলিনির অনুরোধে হিটলার সময়সীমা ১ অক্টোবর নির্ধারণ করেন। পরবর্তী সময়ে হিটলার চেম্বারলিনকে চিঠি লেখেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, যদি সুডেনল্যান্ডকে জার্মানির হাতে তুলে দেওয়া হয় তবে তিনি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করবেন না। সেই সঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করেন যে এটাই জার্মানির সর্বশেষ অঞ্চল দাবি। চেম্বারলিন আলোচনা চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এবার তিনি একা নন, বরং ফরাসি ও ইতালিয়ান নেতাদের নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হন। সমস্যা সমাধানে চেম্বারলিন ইতালিয়ান নেতা বেনিতো মুসোলিনির সহায়তা চান।



ইতালিয়ান স্বৈরশাসক বেনিতো মুসোলিনির অনুরোধে হিটলার সুডেনল্যান্ড হস্তান্তরের সময়সীমা দীর্ঘ করেন;

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইতালির মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। তবে এই আলোচনা যাকে নিয়ে, সেই চেকোস্লোভাকিয়াকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই আলোচনায় আরেক ইউরোপীয় পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ২৯ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের দিন ধার্য করা হয়। সেদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন, জার্মান নেতা হিটলার, ইতালিয়ান নেতা মুসোলিনি ও ফরাসি প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের জার্মানির মিউনিখ শহরে মিলিত হন।

আলোচনায় মুসোলিনি একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন, যাতে জার্মানির সম্প্রসারণ নীতির অবসানের বিনিময়ে সুডেনল্যান্ডকে জার্মানির কাছে সমর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়। এই প্রস্তাব মুসোলিনির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলেও এটি মূলত জার্মান সরকার তৈরি করেছিল। যেকোনো মূল্যে একটি বড় ধরনের যুদ্ধ এড়াতে আগ্রহী চেম্বারলিন ও দালাদিয়ের মুসোলিনির এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। সেদিন রাত প্রায় ২টার সময় (৩০ সেপ্টেম্বর) মিউনিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।



বাম থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের, জার্মান নেতা হিটলার এবং ইতালিয়ান নেতা মুসোলিনি মিউনিখ চুক্তিতে সম্মত হন;

ব্রিটিশ সরকারের অনেকে এই চুক্তিতে সন্তুষ্ট হলেও একটি অংশ এই চুক্তির ফলাফল নিয়ে সন্দিহান ছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই ভেবে সন্তুষ্ট হন যে, তারা একটি যুদ্ধ এড়াতে পেরেছেন। অনেক ব্রিটিশ নেতা এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেন। হিটলার এটা দেখে আশ্চর্য হন যে, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেকোস্লোভাকিয়ার মিত্ররা সহজেই সুডেনল্যান্ডকে জার্মানির হাতে তুলে দিয়েছে, অথচ তিনি ভেবেছিলেন সুডেনল্যান্ড অধিকারের জন্য জার্মানিকে যুদ্ধ করতে হবে। হিটলার যা চান তার সবই মিউনিখ চুক্তি তাকে দিয়েছিল। সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন এই চুক্তিতে হতাশ হন। এই চুক্তির ফলে ইঞ্জ-ফরাসি জোটের উপর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বাস উঠে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবার নতুন পরিকল্পনা সাজাতে থাকে। একপর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইঞ্জ-ফরাসি জোটকে প্রতিহত করতে জার্মানির সঙ্গে চুক্তি করে। এই চুক্তির ফলস্বরূপ, জার্মান বাহিনী ১ অক্টোবর সীমান্ত অতিক্রম করে এবং সুডেনল্যান্ডের জার্মানরা তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। বিপরীতে অনেক চেকোস্লোভাকিয়ান এই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যায়।





১৯৩৮ সালের অক্টোবরে সুডেনল্যান্ডের বাসিন্দাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা পান হিটলার;

যদিও সাময়িকভাবে একটি যুদ্ধ এড়াতে পেরেছে, তথাপি এই চুক্তি ছিল ইঙ্গ-ফরাসি জোটের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভুল। ইঙ্গ-ফরাসি জোট জার্মানির চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয়ে বেশি ভীত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরোধ করতে তারা জার্মানিকে লেলিয়ে দিতে চেয়েছিল। পূর্ব ইউরোপে জার্মান সম্প্রসারণ নিয়ে ইঙ্গ-ফরাসি জোট খুব বেশি উদ্বিগ্ন ছিল না। ইঙ্গ-ফরাসি জোট চেয়েছিল জার্মানি যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিহত করতে গিয়ে ইঙ্গ-ফরাসি জোট জার্মানিকে অপ্রতিরোধ্য ও বেপরোয়া করে তোলে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধভীতিকে পুঁজি করে জার্মানি ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে হিটলার নাকে দড়ি দিয়ে কয়েক বছর ঘোরান। মিউনিখ চুক্তিতে জার্মানি যদিও চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তথাপি চুক্তির ছয় মাস যেতে না যেতেই ১৯৩৯ সালের মার্চে জার্মানি বাদবাকি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে দখল করে নেয়। এই আক্রমণেও ইঙ্গ-ফরাসি জোট উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।



শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে নেয় (হবিতে প্রাণের পতনের পর শহরটি ভ্রমণে হিটলার); image source: Hitler Archive

জার্মানির সম্প্রসারণ নীতির পরবর্তী সম্ভাব্য লক্ষ্য ছিল পোল্যান্ড। ইঙ্গ-ফরাসি জোট এবার পোল্যান্ডের স্বাধীনতা অক্ষত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোট গঠন করে। তবে জার্মানি কি থামার পাত্র! ইঙ্গ-ফরাসি জোট ইতোমধ্যে জার্মানিকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। ইঙ্গ-ফরাসি জোট কর্তৃক এতদিন ধরে জার্মানিকে দেওয়া প্রশ্নের ফলস্বরূপ ১৯৩৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। এর মাধ্যমেই শুরু হয় রক্তক্ষয়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। এই ঘটনা ঘটে মিউনিখ চুক্তির এক বছর পূর্তি হওয়ার আগেই!

ইঙ্গ-ফরাসি জোট যদি মিউনিখ চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে এতটা সুযোগ না দিত, তবে জার্মানি এতটা বেপরোয়া হতে সাহস করত না। শুরুতেই যদি জার্মানির লাগাম ধরে টান দেওয়া হতো, তবে হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো। ইঙ্গ-ফরাসি জোটের ব্যর্থতার ফলেই জার্মানি বেপরোয়া ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এজন্য ১৯৩৮ সালের মিউনিখ চুক্তিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

## ২য় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)

১ম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিপুঞ্জ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়, যদিও এই সংগঠনের মূল আহ্বায়ক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সিনেটের আপত্তির মুখে নিজেই আমেরিকাকে জাতিপুঞ্জের সদস্য করতে পারেননি।

১ম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রপক্ষ ও জার্মানির মধ্যে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি (২৮ জুন, ১৯১৯) – যা ১৯৩৫ সালে হিটলার কর্তৃক বাতিল হয় – ২য় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত করে। এই ভার্সাই চুক্তি জার্মানির মত ইতালির জনগণের মনেও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

২য় বিশ্বযুদ্ধ এখন পর্যন্ত মানব ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিশ্বের ৩০টি দেশের প্রায় ১০ কোটি মানুষ সরাসরি অংশ নিয়েছিল, আর যুদ্ধ শেষে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল সাড়ে ৮ কোটির বেশি, যার মধ্যে সাড়ে ৫ কোটির বেশি ছিল বেসামরিক নাগরিক। এই যুদ্ধে জার্মান নাৎসি বাহিনীর নির্বিচারে ইহুদি হত্যার ঘটনাটা মানব ইতিহাসে অন্যতম বিষাদপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।